মনুসংহিতায় নারীর অবস্থান : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনশাস্ত্রে (এম.ফিল. উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণা পত্র)

বর্ষ : 2018-2019

নাম : জগন্নাথ জানা

ক্রমিক সংখ্যা : MPPH194018

রেজিস্ট্রেশন নং : 133321 of 2015-16

দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

2019

Certified that the thesis entitled 'মনুসংহিতায় নারীর অবস্থান : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা' submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar conference at Jadavpur Univesity thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Jagannath Jana 14/05/19

JAGANNATH JANA
ROLL NO. : MPPH194016
REGISTRATION NO. : 133321 OF 2015-16

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Jagannath Jana entitled 'মনুসংহিতায় নারীর অবস্থান : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা' is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University.

P. Sarkar	Goswami 14/5/19	Bhattacharjee Sinha
Head 14/05/19	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC 14/5/19

Department of ....

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণা পত্রটি হল মনুসংহিতায় নারীর অবস্থান ঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা। এই বিষয়টির ওপর গবেষণা করতে গিয়ে যার তত্ত্বাবধান ব্যতীত গবেষণার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত তিনি হলেন ডঃ গার্গী গোস্বামী Ma'am। তাঁর চিন্তা, মতামত ও ভাষা এবং উৎসাহ ব্যতীত এই গবেষণা কখনই সম্ভবপর হয়ে ওঠত না। এর পিছনে রয়েছে তাঁর নিরলস পরিশ্রম এবং অনেক ক্ষেত্রে তার মূল্যবান সময় অপচয় করেছি। যখনই কোনো বিষয়ে সমস্যা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে Ma'am এর কাছে গিয়ে সেই বিষয়ে সমস্যার সমাধান তিনি করে দিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান অনেক সময় আমায় তিনি দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁর সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। অতঃপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং বিশেষ করে অধ্যাপিকা অতসী চ্যাটার্জী সিনহা Ma'am আমায় নানান বিষয়ে সহযোগীতা, তাঁর মতামত, ভাষা সব দিক থেকে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি ও আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁর সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রতি আমি বিশেষভাবে ঋণী।

যাদের আশীর্বাদে ও উৎসাহের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার কাজ করতে সম্ভবপর হয়েছি তারা হলেন পিতা কার্ত্তিক চন্দ্র জানা ও মাতা সাবিত্রী জানা। তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আর একজনের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ যিনি আমার গবেষণার কাজে নানান ভাবে আমাকে সহযোগীতা এবং উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি হলেন শুভাশীর্ষ জানা। এরা সবাই প্রতি

মুহূর্তে আমাকে লেখার কাজে নানা ভাবে উৎসাহিত করেছে এবং সহযোগীতা করেছে। সর্বপরি আমার সহপাঠক ও সহপঠিকাদের কাছ থেকে নানান সাহায্য ও উৎসাহ সবসময় পেয়েছি। প্রত্যেকের আশীর্বাদ প্রেরণা ও ভালোবাসা একান্ত কামনা করি যাতে ভবিষ্যতে আমার জীবনের চলার পথ আরও সুগম হয়ে ওঠে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিনীত
দর্শন বিভাগ
কলকাতা - ৭০০০৩২ জগন্নাথ জানা

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	i-vii
প্রথম অধ্যায়	১-২৪
বেদে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	২৫-৬১
মনুসংহিতায় নারীর অবস্থানের দার্শনিক পর্যালোচনা	
তৃতীয় অধ্যায়	৬২-৯২
উনিশ শতকে বা আধুনিক যুগে নারী মুক্তির চিত্র এবং তার পর্যালোচনা	
৩.ক - রাজা রামমোহন রায়	
৩.খ - ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর	
৩.গ - স্বামী বিবেকানন্দ	
চতুর্থ অধ্যায়	৯৩-১০৪
উপসংহার	
গ্রন্থপঞ্জি	১০৫-১০৯

-ঃ ভূমিকা ঃ-

আজকের দিনে নারীবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ। এই নারীবাদ প্রত্যেকেরই তথা, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, চিন্তনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘নারীবাদ’ এই শব্দটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করছি। খুব সহজে বলতে গেলে নারীবাদ যেকোনো সমাজে নারীদের লিঙ্গগত বৈষম্য, এই বৈষম্য জনিত শোষণ এবং সেই শোষণের অবসান চায়। নারীদের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা দরকার যা অন্যান্য চিন্তার ক্ষেত্রে খুব একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। যথা নারীবাদ একই সঙ্গে একটি বৌদ্ধিক চর্চাও একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। শুধুমাত্র দার্শনিক ও তাত্ত্বিকদের অবদানে নারীবাদ গড়ে ওঠেনি। নারীদের শোষণের বিরুদ্ধে, নারী পুরুষ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, নারীদের অধিকারের জন্য যারা আন্দোলন করেছেন তারাও তাত্ত্বিকদের মতো সমভাবে নারীবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থাৎ নারীবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে তাত্ত্বিক চিন্তা, দার্শনিক মতবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলন সমানভাবে নারীবাদকে সমৃদ্ধ করেছে।

অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, নারীবাদ একটি বহুমাত্রিক চিন্তা। বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তার দ্বারা বিভিন্ন সময়ে নারীবাদ সমৃদ্ধ হয়েছে। কাজেই বিভিন্ন স্তরে নারীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, নারীদের শোষণের চিত্র ও ভিন্নরকম, তাই নারীবাদ কোনো একটি বা একমাত্রিক ধারণা নয়। কাজেই নারীর সমস্যাকে একটি আর্থ সামাজিক সমস্যা রূপেই দেখা হত। সমস্যাগুলির যে একটি পৃথক তাত্ত্বিক পর্যালোচনার

প্রয়োজন তা মনে করা হয়নি। নারীবাদের অবস্থানগত সচেতনতা, নারীদের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, নারী পুরুষের সমান অধিকারের দাবী নিয়েই নারীবাদী একটি মতবাদ হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে বলা প্রয়োজন যে নারীবাদী তুলনামূলক ভাবে একটি আধুনিক ধারণা। প্রসঙ্গত 'নারীবাদ' শব্দটি সম্ভবত ১৮৭১ সালে ফরাসি চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। নারীবাদের মূল যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তা হল লিঙ্গ প্রেক্ষিত তত্ত্বের কোটিকে স্পর্শ করতে পারে কি পারে না? এবং তত্ত্বের লিঙ্গ প্রেক্ষিত থাকা উচিত কি অনুচিত? এই নিয়ে প্রশ্নগুলির উত্তরভেদে নারীবাদী অবস্থানের ভিন্নতা গড়ে ওঠে।

নারীদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা আমরা নানা রূপে পেয়ে থাকি। ভারতীয় সভ্যতায় নারীদের অবস্থান কেমন ছিল বা কিরকম ছিল তাঁর একটি চিত্র যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে, প্রাগ্‌যুগ থেকে এখন ও পর্যন্ত নারীদের অবস্থান অনেকটা পরিবর্তীত হয়েছে। আমরা যদি এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় দেখি তাহলে দেখব যে, নারীদের অবস্থানটি অনেক উন্নত হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে, বাইরের কাজে যুক্ত হচ্ছে এবং নারীদের অবস্থানটি সব দিক থেকে আরও বেশি উন্নত হয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা সমাজের বিভিন্ন জায়গায় দেখি যে, নারীদেরকে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে, পীড়িত হতে হচ্ছে এবং সেই লাঞ্ছিত বা পীড়িত যে হচ্ছে তা যে সব সময় শোষণ দিয়ে হচ্ছে তা কিন্তু নয়। কিছু ধারণার দিক থেকে ত্রুটি থেকে গেছে। যে ধারণার দ্বারা নারীকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সব সময় একটি অন্য অবস্থান দিচ্ছেন। পিততান্ত্রিক সমাজে নারীদেরকে সর্বদা আদার (Other) করে রাখা হচ্ছে। অর্থৎ যেখানে নারীদেরকে সর্বদা (Other) আদার হিসেবে গণ্য করা হয়। সে যতই শিক্ষিত

হোক না কেন, যতই উন্নত হোক না কেন। নারীদের কাছে গৃহ হচ্ছে তার স্থান, পরিবারের সেবা করাই এবং পতি সেবা করাই যেন তাঁর কাছে মূল্যবোধ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় সমাজে আমরা এখন ও পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যেই এই রকম চিত্র দেখতে পাই। আজকের দিনেও আমরা দেখতে পাই যে, নারীদেরকে পণ এর জন্য পুড়িয়ে মারা হচ্ছে আবার রেপ ও করা হচ্ছে, এই রকম নানা চিত্র আজও আমরা দেখতে পাই। আমি এখানে দেখাতে চাইছি যে, বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নারীর অবস্থান কিরকম ছিল। আমরা জানি যে, ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রাথমিক সময় কাল থেকেই পরিপূর্ণ সংস্কৃতি ছিল। ভারতীয় সমাজ চিত্রে সেই পরিপূর্ণ সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান দেখার জন্য সেই সকল গ্রন্থগুলিকে বেদ, ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যায়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় সভ্যতার সামাজিক চিত্রকে স্পষ্ট ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সকল গ্রন্থগুলির মধ্যে মনুসংহিতার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে. কারণ মনুসংহিতার বিধানগুলি আমাদের বর্তমান যুগে আইনী ব্যবস্থার অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। এই সংহিতায় এমন অনেক রকমের নীতি ও বিধান উল্লেখ আছে যার উপরে ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজের আইনগত নৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়। মনুসংহিতা একটি মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত কাল এবং সামাজিক অবস্থানের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য নিয়ম নীতি ও বিধান দিয়েছেন। বিভিন্ন রীতিনীতি পুরুষ ও নারীর উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন যুগে নারীর অবস্থান কে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করার

জন্য মনুসংহিতা একটি অন্যতম গ্রন্থ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র মনুসংহিতার চর্চা প্রাচীন যুগে নারীর অবস্থানকে বোঝারজন্য সম্পূর্ণ নয়। কারণ মনুসংহিতার প্রেক্ষাপট অনুসৃত হচ্ছে বেদ এবং উপনিষদের যুগ থেকে। সুতরাং মনুর পূর্বসূরী যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগকে অধ্যায়ন করা ও অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমি আমার গবেষণা পত্রকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করেছি, যে অধ্যায়গুলিতে মনুসংহিতা, তার পূর্ববর্তী যুগ এবং তার পরবর্তী যুগের আলোচনা করা হয়েছে। আমি মনে করি যে, এই যুগের যাত্রাপথকে সম্পূর্ণরূপে না জানলে নারীর কালক্রমে যে অবস্থার উন্নতি বা অবনতি হয়েছে তা বোঝা যাবে না। প্রথম অধ্যায়ে বেদে নারীর অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা জানার জন্য আমাদের ঋগ্বেদ সম্বন্ধে জানতে হবে। ঋগ্বেদের বিষয় বস্তুর মধ্যে দিয়ে নারীদের যে নানা চিত্র আমরা পাই তার দ্বারাই বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান কেমনছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে, বৈদিক যুগে প্রথম দিকে নারীদের নানা বিষয়ে স্বাধীনতা থাকলেও তা কিভাবে ধীরে ধীরে সেই স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে এবং নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে গৃহবন্দিনী হয়ে উঠেছে। আবার এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে, বৈদিক যুগের শেষের দিকে নারীদেকে নানাভাবে কটূক্তি করা হয়েছে এবং নারীদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তা খর্ব করা হয়েছে। এছাড়াও বৈদিক যুগের শেষের দিকে নারী জন্মকে পাপ বলে ও বিবেচিত করা হয়েছে।

এই গবেষণা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুসংহিতায় নারীর অবস্থানের দার্শনিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব যে, মনু কিভাবে তাঁর মনুসংহিতায় নারীদের অবস্থান আলোচনা করেছেন। নারীদের অবস্থান দেখাতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, নারীদের জীবনের কয়েকটি স্তর বা ধাপ যথা বাল্য অবস্থান, যৌবন অবস্থান এবং বৃদ্ধ ও বিধবা অবস্থান সম্পর্কে মনুর যে বক্তব্য এবং বিধিবিধান লক্ষ্য করা করা যায়। মনুর বিধিগুলির মাধ্যমে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে তিনি কোনো না কোনো রূপে নারী বিদ্বেষী ছিলেন। মনুসংহিতায় যে কয়েকটি জায়গায় পুরুষের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি পুরুষদের ধর্ম, কর্ম সম্পর্কে সচেতনতা দিয়েছেন যাতে পুরুষরা কোনো ভাবেই যেন সেই নিয়ম লঙ্ঘন না করে পতিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফলে পুরুষরা নারীদের ওপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখার জন্য নারীদেরকে সমস্ত বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং নারীর স্বাধীনতা তো দূরের কথা নারীর নিজের শরীরের ওপর কোনো অধিকার নেই। অবাঞ্ছিত সম্ভোগ থেকে ও নারী নিজেকে গচ্ছিত রাখতে পারে না। কাজেই নানা ভাবে মনু নারীদের স্বাধীনতা কে খর্ব করেছেন এবং নানাবিধি বিধানের দ্বারা নারীদেরকে সম্পূর্ণ রূপে গৃহ বন্দিনী করে তুলেছেন। মনুসংহিতা পাঠের দ্বারা আমরা ভালোভাবেই নারীর যে নানা অবস্থান তা খুব সহজে অনুধাবন করতে পারি। তাই এই গবেষণা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে মনুসংহিতায় নারী অবস্থানের দার্শনিক পর্যালোচনা তা পাঠ করা আবশ্যক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বৈদিক যুগের পরবর্তী সময় থেকে আমরা দেখতে পাই যে, নারীর কোনো নিজস্ব অধিকার, স্বাধীনতা নেই, তাই নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে

আনার জন্য নারীমুক্তি আন্দোলন দেখা যায়। এখানে নারীমুক্তি বলতে নারীর আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়। পিতৃতন্ত্রের যে ধ্যান ধারণা নারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে তার থেকে নারীমুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই নারীমুক্তির প্রসঙ্গে আমরা উনিশ শতকে কিছু সমাজসংস্কারকদের কথা পাই যারা নারীমুক্তির জন্য নানা আইন প্রণয়ন করেছেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা ও করেছেন। আমি আমার গবেষণা পত্রে কয়েকজন সমাজসংস্কারক এর কথা উল্লেখ করেছি যথা রামমোহন। উনি নারীমুক্তির জন্য সতীদাহ রোধ করে বা বন্ধ করে নারীমুক্তির পথকে প্রশস্ত করেছেন। আবার বিদ্যাসাগার মহাশয় বাল্য বিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করে নারীমুক্তির জন্য এবং নানাধিক আইন প্রণয়ণ করেন নারীদের জন্য। অপর দিকে আমরা বিবেকানন্দ কথা পাবো এই গবেষণা পত্রে। উনি নারী শিক্ষার সাথে সাথে নারীমুক্তির জন্য বলেন যে শিক্ষা নারীকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এবং নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করে সেই শিক্ষার কথা বলেছেন। বিবেকানন্দ নারীমুক্তি বলতে সামগ্রিক কিছু মুক্তির কথা বলেননি। তিনি আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা বলেন। এই নারীমুক্তির বিষয়ে আমরা আবার নারীবাদী দার্শনিকদের মত পাবো যারা নারীমুক্তি বিষয়ে বলেছেন যে নারীদের কে empowerment দেওয়া হলে নারীমুক্তি হতে পারে এই সব বিষয় নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত আমরা যে নারীর নানান অবস্থান পর্যালোচনা করলাম তাতে কি কোনো ভাবে বা আদৌ নারীমুক্তি সম্ভব হয়েছে? নারীবাদী দার্শনিকগণ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে নারীমুক্তি তখনই সম্ভব হবে যখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে একত্রিত

হয়ে এই নারীমুক্তি আন্দোলনে অংশ নেবে এবং নারীদেরকে লিঙ্গ বৈষম্য থেকে মুক্ত করবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফলে আমাদের ভাষার মধ্যে, আমাদের মানসিকতায় যে লিঙ্গ জ্ঞানটি জড়িয়ে রয়েছে তা যদি মুক্ত করা যায় তবেই নারীমুক্তি সম্ভব হবে। এই লিঙ্গ নীতিটির মধ্যে দিয়ে নৈতিকতার প্রশ্নটি উঠে আসে। নারীবাদী দার্শনিক ওলস্টোনক্র্যাফট নারীদের নীতিবোধ এর মধ্যে দিয়ে নারীমুক্তি চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

-ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ-

বেদে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা

যেকোন দেশের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সেই দেশের প্রাচীন সাহিত্যকে জানা প্রয়োজন। কারণ রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রাচীন সাহিত্যিকে জানা যায় না, তাই সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সেই দেশের ইতিহাসকে জানা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সূত্রপাত হয় বৈদিক সাহিত্য দিয়ে। কারণ এর থেকে প্রাচীনতর কোনো পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের বিবরণ পাওয়া যায়নি। এবার বৈদিক যুগ বলতে আমরা কি বুঝি? যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল তাই বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগে সাহিত্যে প্রধাণত বেদ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য অর্থাৎ প্রধাণত শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্মসূত্রের কথা আমরা জানতে পারি। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদ হল সব থেকে প্রাচীনতম গ্রন্থ। কাজেই বৈদিকযুগ জানতে গেলে আমাদেরকে ঋগ্বেদ এর বিষয় বস্তু সম্পর্কে ভালো ভাবে জানতে হবে। ঋগ্বেদ এর রচনা কাল নির্ণয় নিয়ে নানা মতানৈক্যের পার্থক্য দেখা যায়। নানা মনীষী ঋগ্বেদ এর কাল নির্ণয় নিয়ে নানা তথ্য দিয়েছেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর গোড়ার থেকে উত্তর পশ্চিম থেকে আর্য জাতির ভারত বর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং সেখানে অধিষ্ঠিত যে প্রাচীনতর নগর ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সংঘর্ষে আসো। ঋগ্বেদ এর সূত্র গুলিতে সেই সংঘর্ষের সূত্রপাত রয়েছে। ঋগ্বেদ রচিত হয় আর্য জাতি সিন্ধু উপত্যকা বাসীদের পরাস্ত করার পরে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করার পর। ভারতে প্রবেশ এবং বসতি করে ঋগ্বেদ রচনা শুরু করতে কয়েক শতাব্দী কাল সময় লাগবে অনায়াসে অণুমান করা যায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে ঋগ্বেদ এর রচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী তা অনুমান করা যায়। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু প্রমাণ ও পাওয়া যায়। একটি মিটানিয়ান নথী পাওয়া গেছে যার আনুমানিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দ ধার্য করা হয়েছে।

তাতে কতকগুলি ঋগ্বেদ এর দেবতার নাম উল্লেখ রয়েছে। তা থেকে পিগোট অনুমান করেন ঋগ্বেদ এর রচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০-১৫০০ শতাব্দীর মধ্যে।[১]

হিন্দু সমাজে নারীর স্থান শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে অত্যন্ত অবনমিত অবস্থায় চলে এসেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতের ফলে কয়েকজন প্রগতিশীল দেশনেতা তার এই দুদর্শার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের মধ্যে রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যতম। তাঁদের নেতৃত্বে নারী সমাজে উন্নয়নের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় তা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারী সমাজে ন্যায্য স্থান অধিকারে যে সকল শাস্ত্রগুলি বাধা ছিল তা দূরীভূত হয়। বর্তমানে নারী সমাজে নিজের ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায় করে নেবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন। তুলনায় দেখে ভারি তৃপ্তি হয় যে, ঋগ্বেদ এর যুগে নারী সমাজে একটি সম্মানের স্থান অধিকার করতো। এক রকম ভাবে বলা যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজগত অধিকারের কোনো পার্থক্য রাখা হত না। ঋগ্বেদ এর বিরাট সাহিত্যের মধ্যে ছড়ানো যে নানা তথ্য পাওয়া যায় তার দ্বারাই এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করা যায়।

বৈদিক যুগে সমাজে ঋগ্বেদ এর সময় নারী জাতির স্থান অনেকটা উন্নতকর ছিল। বৈদিক পাঠ্য পুস্তকে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে যা বর্ণিত আছে তার একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করছি। পুরুষগণের শিক্ষার সুস্পষ্ট ও স্ববিস্তার বর্ণনা

---

[১] *ঋগ্বেদ সংহিতা* (প্রথম খন্ড), রমেশ চন্দ্র দত্ত (অনুবাদ), শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ: নং ৩৬-৪৬

বেদে রয়েছে। ছাত্র জীবনকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য এবং প্রথমজীবন ছিল তার কার্যকলাপ। বৈদিক সাহিত্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বেদে স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় না এবং সে যুগে নারীদের জন্য কোনো শিক্ষালয় ছিল কিনা সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগের সমাজে কন্যাদের কখনও কখনও কিছু শিক্ষা দেওয়া হত, যদিও বৈদিক শিক্ষা থেকে নারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে।[২] বৈদিক যুগে ঋগ্বেদ এর সময় কিছু সংখ্যক নারী শিক্ষার প্রসার অনেক বেশী ছিল এবং পুরুষদের সাথে সাথে নারীরা শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। কেবলমাত্র ব্যবহারীক জীবনে নয়, ভাবজগতে নারী জাতির স্থান পুরুষদের সমতুল্য ছিল। ঋগ্বেদ এর ঋষিরা একথা সমর্থন করতে ও কুণ্ঠিত ছিল না। নারীরা কেবলমাত্র অধ্যাত্ম সাধনায় নয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করতেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যদিও নারীর স্থান ও মর্যদা সব সময়েই কিছু নিম্ন স্তরে হয় তা সত্ত্বেও কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াটা পিতামাতার কাছে একেবারে অবাঞ্ছনীয় ছিল না। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে ঋগ্বেদ এর সমাজে পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়া আবশ্যক। কারণ পুত্র সন্তান বংশ ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৃহদারন্যক উপনিষদে একটি উক্তি থেকে এটাই প্রমাণীত হয় যে, শিক্ষিত পুত্রের মতেই শিক্ষিতা কন্যা পিতা মাতার কাছে একান্ত কাম্য ছিল।[৩]

[২] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১২, পৃ: নং ১২১.

[৩] বৃহ. আ. উ. ৬/৪/১৭ - ''অথ য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পন্ডিতা জায়তে
সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিস্মন্তমশ্লীয়াতাম্।''

ঋগ্বেদ এর প্রাথমিকপর্বে নারীগণের শিক্ষা লাভ বিষয়ে কোনো বিধি নিষেধ ছিল না। বৈদিক সমাজে সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে নারী শিক্ষার সমাদর ছিল কিনা সে কথা সঠিক ভাবে বলা যায় না। তবে উচ্চ শ্রেণীর আর্যগণ যে নারী শিক্ষা বিষয়ে পক্ষপাতী ও উৎসাহী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঋগ্‌বেদের সময় কালে মেয়েরা বেদ পাঠে অধিকারিনী ছিলেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে নারীদের অধিকার ছিল এবং সে কারণে উপনয়ন বিধি পুরুষদের মতন নারীর ক্ষেত্রে ও অবশ্য কর্তব্য ছিল। কারণ বৈদিক বিধি অনুযায়ী উপনয়ন সংস্কারে দ্বারা সংস্কৃত হলে তবে সে যুগের বেদ পাঠের অধিকার পাওয়া যেত। সেই জন্যই উপনয়নকে দ্বিতীয় 'জন্মলাভ' বা 'আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু' বলা হত এবং যাদের উপনয়ন হত তাদের তাদের 'দ্বিজ' বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১-৫-৪-১২) এই উপনয়নে দীক্ষিত 'দ্বিজ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে - ''আচার্য ছাত্রের মাথায় তার দক্ষিণ হাত রেখে তার মনে ভাগবৎ ভাবে পূরণ করে দিতেন। তৃতীয় রাত্রে আচার্য হতে এই অব্যক্তভাব শিষ্যের মনে প্রবেশ করে এবং সাবিত্রী যন্ত্রের সহিত সে তার প্রকৃত ব্রাহ্মণতত্বে উপনীত হতেন। এটাই তাঁর আধ্যাত্মিক নবজন্ম।''[৪] ঋগ্বেদ এর সমাজে নারীরা শিক্ষালাভ করতে পারতেন ষোল বা সতের বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর তাদের বিবাহ দেওয়া হত। ঋগ্‌বেদের সময় বাল্য বিবাহ ছিল না। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েই নারীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। কারণ নারীগণের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে স্পষ্টত উল্লেখ না থাকলেও যজুর্বেদ (৮/১) বা অর্থব বেদে (১১/৫) বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচর্যাবস্থা যথাযথ ভাবে যাপন করে রমনীগণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন।[৫] ঋগ্বেদের সময়

[৪] যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* কলকাতা, ২০০৫, পৃ: নং ১৮৬.
[৫] অ. বে. ১১/৭/১৮ - ''ব্রহ্মচর্যেন কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।''

নারীদের পতি নির্বাচনের ব্যাপারে কিছুটা হলেও স্বাধীনতা ছিল। যথা - ''স্বয়ং সা মিত্রং বৃণুতে চিৎ''। (১০/২৭/১২) ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি এ বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ। প্রথম মন্ডলে ও বলা হয়েছে - ''হে বলবান্ ইন্দ্র! যেমন আকাঙ্খাবতী পত্নী আকাঙ্খাবানপতিকে প্রাপ্ত হয় তেমনি মেধাবীগণের স্তুতি তোমায় স্পর্শ করে।''[৬]

আবার আমরা ঋগ্বেদ সময় কালে দেখতে পাই যে, সেই সমাজ ব্যবস্থায় বাল্য বিবাহের প্রচলন না থাকায় নির্দিষ্ট কয়েক বছর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে নারীদের কোনো বাধা ছিল না। ঋগ্বেদ এর সময় নারীদের দুটি ভাগ ছিল যথা - 'ব্রহ্মবাদিনী' এবং 'সদ্যোবধূ'। শিক্ষালাভ সমাপ্ত করে যারা বিবাহ করতেন তাদের 'সাদ্যোবধূ' বলা হয় আর যারা অধিক দিন অবিবাহিত থেকে শিক্ষা লাভ করতেন তাদের 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হত। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁরা পবিত্র অগ্নি রক্ষা করতেন। একটি উৎসবের মাধ্যমে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত হয়ে সদ্যোবধূদের বিবাহ হত - 'সদ্যোবধূনাং তু উপস্থিতে বিবাহে কথাঞ্চিৎ উপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।''[৭] এই মন্তব্যের দ্বারা এটা প্রমাণিত হত যে, দ্বিজ নারীগণ অথবা উচ্চ তিনটি বর্ণের নারীগণের পুরুষদের ন্যায় উপনয়ন হত। এটাই ছিল একটি বিশেষ অপরিহার্য্য বিধি। এই ব্রহ্মবাদিনী নারীগণ বিবাহ না করে তারা বিদ্যাচর্যায় জীবন অতিবাহিত করতেন। বিদ্যাচর্চায় প্রভৃত সুযোগ লাভ করে তারা প্রায়ই বেদের বিশেষ কোনো শাখায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করতেন।

[৬] ঋ.স. ১/৬২/১১ ''সনাযুবো নমসা নব্যো অর্কে / বর্সুযবো মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ / পতিংন পত্নীরুশতীরুশন্তং / স্পৃশন্তি শবসাবন্ মনীষাঃ''।

[৭] যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* কলকাতা, ২০০৫, পৃ: নং ১১৭.

বৈদিক ভারতের নারীরা শুধুমাত্র জ্ঞান চর্চায় সম্যুকর্ষ লাভ করতেন তা নয়, প্রকাশ্যে শিক্ষাদানের ভার ও তারা গ্রহণ করতেন।

আবার আমরা দেখতে পাই যে, বৈদিক যুগের শেষের দিকে নারীদের শিক্ষার প্রসঙ্গে দেখা যায় ব্রহ্মচর্য যা বেদ অধ্যায়নের প্রবেশদ্বার তা বহু প্রাচীন যুগে নারীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ নারীদের শিক্ষালাভের পথ রুদ্ধ বা বন্ধ ছিল। অর্থব বেদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা নারী স্বামী লাভ করবে।[৮] এর থেকে মনে হয় ব্রহ্মচর্য যেন কোনো ব্রত বা শিব পূজোর মতো কিছু, যার উদ্দেশ্যে হল স্বামীলাভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঋগ্বেদ এর সময়ে আমরা দেখি যে কিছু কিছু ঋষিকার নাম পাই, যারা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হলেন বিশ্ববারা (১-১২৬), রোমশা, লোপামুদ্রা (১-১৭৯), অনভৃনিবাক্ (১০-১২৫) জুহু, পৌলোমী, কাক্ষীবতী, ঘোষা, জরিতা, অপলা ও গোধা[৯] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই নামগুলি ব্যতিক্রমের মতো অর্থাৎ কোনো কোনো নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ পেতেন। কিন্তু শাস্ত্র দেখলে বোঝা যায় নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। তাই শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - ''স্ত্রিয়ঃ সতীঃ ত উ যে পুংসাঃ অহুঃ''[১০] অর্থাৎ নারী হয়েও তারা পুরুষ। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগ থেকে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা এতই কম যে তা আঙুলে গোনা যায়। ক্রমে যে অবস্থা দাঁড়াল তাতে গণিকা ছাড়া শিক্ষাতে আর কোনো নারীর অধিকার ছিল না। বৈদিক যুগের একেবারে প্রথম পর্বের পরে শিক্ষাতে ও নারীর আর অধিকার নেই। কারণ

---

[৮] অ. বে. ১১/৫/১৮.

[৯] যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* কলকাতা, ২০০৫, পৃ: নং ১৯৬.

[১০] তৈ. সং ১/১১/৪.

দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপনয়নে নারীর আর কোনো অধিকার রইল না। জন্মবধি তার সম্বন্ধে সমস্ত সংস্কারই অমন্ত্রক।[১১] অর্থাৎ নারীদের আর কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে না। কারণ সে যুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে মন্ত্র দিয়েই হত। কাজেই বিদ্যা অর্জনে নারী আর অধিকার থাকলো না। কাজেই মন্ত্র উচ্চারণে বা হব্যদানে নারীর আর কোনো অধিকার নেই।

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে গণিকাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রতিশব্দ সম্ভবত নিম্ন শ্রেণি বা স্তর এর মধ্যে গণিকাদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ বেদে নানা নামে গণীকাদের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা - হস্ত্রা, অগ্রূ, সাধারণী ও সামান্য,[১২] আবার অর্থববেদে পুংশ্চলী[১৩] নামে গণিকাদের পরিচয় পাওয়া যায় সামান্য। এছাড়াও রাজয়িত্রী, অতিস্কদ্বরী, অপস্কদ্বরী[১৪] ইত্যাদি নামে গণিকাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের অধিকার কর্তব্য এবং সামাজিক অবস্থান আরও স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গণিকাদের সরকারি ব্যায়ে নানা কলায় শিক্ষা দেওয়া হত এবং তাদের মূল্য ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে রাজগৃহে সালাবতী প্রতি রাত্রে একশত কার্যাপণ দাবি করতো এবং আম্রপালীর দক্ষিণা নিয়ে রাজগৃহে ও বৈশালীর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল।[১৫] সম্ভবত গণিকার প্রসাদ, দাসদাসী, সংসার সব কিছুই

---

[১১] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *বৈদিক সমাজে নারীর স্থান,* কলকাতা, ২০১২, পৃ: নং ২৫১.

[১২] ঋগ্বেদ ৪/১৬/১৯, ৩০; ৪/১৯/৯ ও ১; ১৬৭/৪; ২/১২/১২, ১৫, ১৬.

[১৩] অ. বে. ১৫/১/৩৬; ২০/১৩৬/৫.

[১৪] ব্রা. সং ৩/১.

তৈ. ব্রা. ৩/৪/১১/১.

[১৫] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার,* কলকাতা, ২০১২, পৃ: নং ১২৭.

ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি।[১৬] এর অর্থ হল গণিকার যে শুধু স্বত্ত্ব ছিল না তাই নয়, তা বেচবার, বাঁধা দেওয়ার বা দাণ করার ও অধিকার ছিল না। এই নিয়ম গণিকালয়ে যারা থাকতেন তাদের জন্য কার্যকর ছিল। রাষ্ট্র যে গণিকার শিক্ষার ভার নিতেন তার দুটি কারণ ছিল, যথা - রাজা এবং তাঁর সভাসদরা অনেক সময়েই বিনোদনের জন্য যুবতী ও সুন্দরী গণিকাদের ডাকতেন এবং অপর আর একটি কারণ হল গণিকারা সুকৌশলে তাদের খদ্দেরদের কাছ থেকে নানান রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিক সংবাদ আদায় করতেন। গণিকারা রাজার মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন এবং তাদের উপায় রূপে ব্যবহার করতেন। সেই সংবাদগুলি সংগ্রহ করার জন্যই অধিকাংশ সময়ে গণিকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হতেন। এইসবের জন্য রাজকোষ থেকে গণিকাদের ১৫০০-২০০০ পন বার্ষিক বেতন ও দেওয়া হত। সম্ভবত সেই কারনে গণিকারা প্রায় স্বাধীন ভাবে ধনী হতেন এবং তারা রাষ্ট্রকে কর ও দিতেন। বৈদিক যুগে আমরা এটা ও দেখতে পাই যে, সেই যুগে সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষরা যখন খুশী গণিকালয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পুরুষরা যে উপপত্নী ও গণিকা সম্ভোগ করতেন তাতে সমাজ কোনো বাধা দেয়নি, কিন্তু স্বামীর হাজার দোষ থাকলেও নারী উপপতি গ্রহণ করলে সমাজে সেটা মহাপাতক বলে গণ্য করা হত। আর গণিকালয়ের মতো কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নারীদের জন্য কখনওই ছিল না।

বৈদিক যুগে আমরা এটাও দেখতে পাই যে, যদি কোনো পুরুষ শিক্ষিতা নারীর সান্নিধ্য পেতে চায় তাহলে তাকে গণিকালয়ে যেতে হত। কারণ গণিকারা একমাত্রই শিক্ষিত ছিল, এবং প্রাচীন ভারতে সেই একমাত্র স্বাধীন

[১৬] মতিচন্দ্র, *দি ওয়ার্ল্ড অফ কার্টিমানস,* বিকাশ ১৯৭৩, পৃ: নং ৪৮.

নারী ছিল। বৈদিক সমাজে এই গণিকাদের সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন এবং কুলবধূকে সর্বদিক থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে চূড়ান্ত অপমানের ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিল। শিক্ষিত স্বামীর কামনা বাসনা যখন তাঁর স্ত্রী চরিতার্থ করতে না পারতেন তখন সমাজে স্বাধীন যৌবনা শিক্ষিতা গণিকাদের দিকে শিক্ষিত পুরুষদেরকে এগিয়ে দিলেন এবং কুলনারীদেরকে অসম্মানের পাত্রী করে তুলতে ও দ্বিধা বোধ করেন নি।[১৭] এই দিক থেকে ও মনু নারীদের কে কোনোভাবে স্বাধীনতা দেননি।

বৈদিক যুগে সমাজব্যবস্থায় আমরা আট ধরণের বিবাহের কথা পাই। তার মধ্যে কয়েকটিতে বধূর পিতা বরের আত্মীয়দের অর্থ দিতেন যা পণ নামে পরিচিত। অর্থাৎ বৈদিকযুগে সাহিত্যে আমরা পণ প্রথার প্রচলন দেখতে পাই। বিশেষ করে অসুর বিবাহের ক্ষেত্রে বধূর পিতা মাতাকে এবং বধূকে পণ দিতেন।[১৮] কারণ তার নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থায় কন্যার পিতা যেমন বরের পক্ষকে পণ দিতেন ঠিক তেমনি আবার কিছু ক্ষেত্রে বরের বাড়ি থেকে বধুর পিতা মাতা এবং বধূকে ও পণ দিতেন। বরের জন্য পণ হল hypergamy অর্থাৎ উচ্চতর বিবাহ প্রথা, যা ক্রমিক স্তর বিশিষ্ট বর্ণগুলির মধ্যে ব্যপক ভাবে থাকে। উচ্চতর শ্রেণিগুলিতে তাকে পণ বলা হয় আর নিম্মতর শ্রেণিগুলিতে প্রধাণত কন্যাশুল্ক নামে পরিচিত।[১৯] পণই হোক আর কন্যা শুল্কই হোক তা সমাজের সম্পন্নতার পরিচয়, কিন্তু বরপণ কন্যাশুল্কের চেয়ে অনেক বেশি

---

[১৭] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *বৈদিক সমাজে নারীর স্থান,* কলকাতা, ২০১২, পৃ: নং ২৫১.
[১৮] মনুসংহিতা ৩/৩১৭.
[১৯] এম. এন. শ্রীনিবাস, *The cohesive Role of Sanstitisection,* Oxford University Press, পৃ: নং ১২১, টীকা - ৫।

প্রচলন ছিল। আমরা বৈদিক যুগে দেখতে পাচ্ছি যে কন্যা হোক বা বর হোক উভয় ক্ষেত্রে ক্রয় ও বিক্রয় এর কথা উঠে আসে। কৌটিল বলেছেন - ‘‘ম্লেচ্ছদের পক্ষে কন্যাবিক্রয় নিন্দনীয় নয়’’[২০] আবার যাজ্ঞবল্ক্য খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলেছেন, পুত্র বা কন্যা কাউকেই বিক্রয় করা যায় না।[২১] আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৈদিকযুগে সমাজ ব্যবস্থায় যে কুমারীকে বিক্রি করা বা কেনা হয়েছে তাকে কখনও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যায় না। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কুমারীদের বেচা কেনা হত।

বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের বিবাহের সময় কন্যাকে তার পিতা মাতা এবং আত্মীয়স্বজন যা দিতেন তা স্ত্রীধন নামে পরিচিত। এই স্ত্রীধন তিন প্রকার। যথা - ‘পণ’ - যা দিয়ে বধূকে কেনা হত, ‘যৌতুক’ অর্থাৎ বিবাহের সময়ে আত্মীয় বন্ধুরা বধূকে যে উপহার দিতেন এবং ‘সৌদায়িক’ অর্থাৎ বধূ বা বরের গৃহে আত্মীয় বন্ধুরা বধূকে বা দম্পত্তিকে দেওয়া উপহার। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন - নারীকে তার বন্ধু, মাতা, স্বামী, বা ভ্রাতা যা দেয় তা হল স্ত্রীধন।[২২] তার আত্মীয়স্বজন অর্থাৎ তার পিতা মাতার সঙ্গে সম্বন্ধীয় ব্যক্তিরা এবং তার স্বামী অথবা পিতার পরিবার তাকে বিবাহের পর শুল্ক স্বরূপ যা দেয় তাও স্ত্রীধন।[২৩] বধূর পিতা যে পণ দিতেন তা বর ও তার পিতাকে দিতেন, ফলে তা স্ত্রীধনের অংশ হতে পারে না এবং তার ব্যবহার বা অপব্যবহারে সম্বন্ধে স্ত্রী কোনও কথাই বলতে পারত না। আর ও বলা হয়েছে - ‘ব্রহ্ম, দৈব, আর্য বা প্রজাপত্য বিবাহে নিঃসন্তান নারীর স্ত্রীধন

---

[২০] ঋগ্বেদ ৩/৭৩.
[২১] ঋগ্বেদ ২/ ১৭৫.
[২২] ধর্মসূত্র ২.
[২৩] যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মসূত্র ২/ ১৪৫; ১৪৭.

তাঁর স্বামী পায়।' তাই নারী তার নিজস্ব সম্পত্তি ব্যবহার করবে সমাজ এটা দেখতে পারত না বা মেনে নিতে পারত না। বশিষ্ট খুব স্পষ্ট ভাবে তা প্রকাশ করেছেন - 'স্বামীর পুন বিবাহের সময়ে তাকে যা দেওয়া হয়েছে যা তাকে তার আত্মীয়স্বজন দিয়েছে সৌদায়িক বা যৌতুক হিসাবে এবং তার শুল্ক অর্থাৎ যা তাকে বিবাহের পর দেওয়া হয়েছে তা নারীর সম্পত্তি, তাঁর স্ত্রীধন।[২৪] প্রাচীন গ্রন্থ মৈত্রায়নী সংহিতা যা আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর বৈদিক গ্রন্থ। যেখানে বলা হয়েছে - ''নারীর যে আত্মীয়েরা তার স্ত্রীধন, গাড়ি, কাপড়চোপড় এবং স্বর্ণালংকার - বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা পাপ করছে এবং পরলোকে তারা আরও দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে।[২৫] আবার জৈমিনিও বলেছেন যে নারী বিশেষ কোন কোন ধরণের সম্পত্তির অধিকারিনী, কিন্তু কাত্যায়ন বলেন নারী তার শিল্প কর্মের দ্বারা যা উপার্জন করে এবং যা অপরে ভালো বেসে তাকে দেয়, স্বামী তার অধিকারি। বাকি যা থাকে তা স্ত্রীধন।[২৬] এর থেকে পরিস্কার যে বিশেষ কিছুই আর বাকি থাকে না। কারণ কাত্যায়নের নির্দেশ অনুসারে নারীর উপার্জন এবং উপহার স্বামীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অন্য কোনো রকম স্ত্রীধন কল্পনা করা যায় না।

আবার আমরা ঋগ্বেদের সময় কালে দেখতে পাই যে, নারীদেরকে বিবাহ করতেই হবে এমন কোনো রীতিনীতি ঋগ্বেদের সময় ছিল না।[২৭] বৈদিক যুগে সমাজে অবিবাহিতা নারীরা পিতৃগৃহে থাকা কালিন পিতার সম্পত্তি ভোগ করতে পারতেন তারও উল্লেখ ঋকমন্ত্রে পাওয়া যায়। যথা - ''হে ইন্দ্র

[২৪] বিষ্ণুধর্মসূত্র ১৫/১১/১৮.
[২৫] মৈ. সং. ১/১১.
[২৬] মৈ. সং. ৫/৯০৪.
[২৭] ঋ. সং. ১০/৩৯/১৪, ১/১০৯/২, ৬/২৮/৫, ১০/২৭/১২.

যাবজ্জীবন পিতামাতার সঙ্গে অবস্থিতা দুহিতা যেমন নিজ পিতৃকুল থেকেই ভাগ প্রার্থনা করে, তেমনি আমি তোমার নিকট থেকে ধন প্রার্থনা করি।''[২৮] বৈদিক যুগে সমাজে কেবলমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলন ছিল। মেয়েদের বহু বিবাহ বা একাধিক প্রতি গ্রহণের অধিকার প্রথম দিকে ঋগ্বেদের যুগে হয়তো ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রথার অবলুপ্তি ঘটে। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ করা বলা হয়েছে- ''যজ্ঞে একটি দন্ডকে বেষ্টন করে থাকে দুটি বস্ত্রখন্ড; তাই পুরুষ দুটি স্ত্রী গ্রহণের অধিকারী; একটি বস্ত্রখন্ডকে দুটি দন্ড বেষ্টন করে না, তাই নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ।''[২৯] বৈদিক সমাজে পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন থাকলেও তারা যৌথ ভাবে গৃহে স্বামী স্ত্রী সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গৃহিনী রূপে রমনী বা নারীকে অনেক দায়িত্ব বহন করতে হয়। ঋগ্বেদের মন্ত্রের উপমার মধ্য দিয়ে রমনীর এই পারিবারিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে - ''গৃহিনী যেমন জাগরিত হয়ে সকলকে জাগরিত করেন ঊষা ও জগৎজনকে তেমনি জাগরিত করেন।'' (ঋ. সং - ১/১২৪৪) কেবল পারিবারিক জীবনে স্ত্রী কর্তৃত্ব করতেন তাই নয়, ধর্ম আচরনের ক্ষেত্রেও তাঁর অকুণ্ঠ অধিকার ছিল। শতপথ ব্রাহ্মনে বলা হয়েছে ''অযজ্ঞিয়ো বা এষ যোপত্নীক :'' অর্থাৎ অপত্নিক ব্যক্তির যজ্ঞের কোনো অধিকার ছিল না। ঋগ্বেদের মন্ত্রে ও সপত্নীক যজমানের যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রধান যজ্ঞে 'পত্নী সংযাজ' নামে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত।

---

[২৮] ঋ. সং. ২/১৭/৭.
[২৯] তৈ. সং. ৬/৪/৪/৩
তৈ. ব্রা. ১/৩/১০/৫৮

এতে যজমানের পত্নীকে অংশগ্রহণ করতে হত এবং বেদের কিছু মন্ত্র তাঁর পাঠনীয় ছিল। ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত কথকগুলি মন্ত্র যেমন ''তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যাজমান দম্পতিই তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমান হব্যদান পূর্বক তোমার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ করেছে '' (১/১৩১), এছাড়াও ''হে অগ্নি তুমি বলশালী পরিণত দম্পতি ধর্ম কর্ম দ্বারা জীর্ণ হয়ে একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করছে।'' (৫/৪৩/১৫) ইত্যাদি স্বামী স্ত্রী একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

বৈদিক যুগে শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই যে, যজ্ঞে যজ্ঞমানের পত্নী থাকতেন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে। তাঁর উপনয়ন নেই, অতএব 'ন স্ত্রী জুহুয়াৎ' নারী হোম করতে পারবে না।[৩০] অথচ আমরা শুনতে পাই যে - 'পূর্বাধো বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্যূর্জঘনাধং পত্নী'।'[৩১] অর্থাৎ যজ্ঞে পূর্বাধ যজ্ঞমান উত্তরার্ধ যজ্ঞমান পত্নী। কিন্তু এই কথাটি যজ্ঞে কোনো অংশে গ্রহণ করা হত না, শুধু পাশে বসে থাকত। এতটাই নিষ্ক্রিয় তার ভূমিকা যে রাম সোনার সীতা গড়িয়ে নিয়ে যজ্ঞ নিষ্পাদন করতে পেরেছিলেন। গৌতমধর্মসূত্রে দেখা যায় যে - 'অস্বতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী' ধর্ম আচরণে নারীর কোনো স্বাতন্ত্র নেই।

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে যথেচ্ছ শাসন ও ভোগ করবার অধিকার শাস্ত্র পুরুষকে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্যে যা দায়িত্ব দিয়েছেন তা খুবই নগন্য। বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে - 'সর্বেষাং বর্ণনাং বধু রক্ষ্যতমা ধনাৎ'[৩২]

---

[৩০] আপস্তম্বধর্মসূত্র ২/৭/১৫/১৭
[৩১] শ. ব্রা. ১/৯/২/২/২, ৩/৪/২২, ৫/২/১-১০
[৩২] বৌদ্ধায়নধর্মসূত্র ২/৪২.

অর্থাৎ সমস্ত বর্ণের উচিত ধনের চেয়ে স্ত্রীকে রক্ষা করা কিন্তু কার্যে তা হয় না। এক্ষেত্রে চাণক্যের চূড়ান্ত সুবিধাবাদী নীতিটি যথা - 'আত্মনং সততং রক্ষদ্দারৈরপি ধনৈরপি।'[৩৩] অর্থাৎ নিজেকে সর্বদাই রক্ষা করবো। প্রয়োজন হলে ধন বা স্ত্রীর বিনিময়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সাধারণ ভাবে নারীর উপার্জন বা সম্পত্তির অধিকার ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থ শতপথ ব্রহ্মনে বলা হয়েছে - পত্নীর সম্পত্তির উপরে কোনো অধিকার নেই, এমনকী নিজের শরীরের উপরেও নয়।[৩৪] শতপথ ব্রাহ্মনে এর আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যজ্ঞে লাঠি দিয়ে হবিকে পেটানো হয় যেমন তেমনি স্বামী ও স্ত্রীকে পেটাবে যাতে তার নিজের শরীর বা সম্পত্তির ওপরে কোনো অধিকার না থাকে।[৩৫] আবার বৃহদারন্যকোপনিষদে স্বয়ং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন - ''স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে, তাতে অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।''[৩৬] এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নারীর মন বলে যে কিছু আছে একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে এবং তার দেহে তার কোনো অধিকার নেই। নারীদের অসম্মান শুধু নয়, মারধোর করারও পূর্ণ অধিকার স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। কাজেই বৈদিক সমাজেও নারীর যে নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল তা কখনো প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। পুরুষরা নারীদের ওপরে নিজের আধিপত্য কায়েম রেখেছে। বার বার বলা হয়েছে যে নারীর সভায় যাওয়ার অধিকার নেই (মৈত্রায়নী সংহিতা - ৮/৯/৪), কোনো

---

[৩৩] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার,* কলকাতা, ২০১২, পৃ: নং ১৩১.

[৩৪] শতপথ ব্রাহ্মণ ৪/৪/২/১৩.

[৩৫] শ. ব্রা. ৪/৪/৩/১৩.

[৩৬] বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৬/৪/৭.

শিক্ষা পাওয়ার অধিকার নেই, ধন অর্জন বা স্বাধীনভাবে ভোগ করার অধিকার নেই, এমনকি নিজের দেহটিকে ও অবাঞ্ছিত সম্ভোগ থেকে রক্ষা করার অধিকার নেই।[৩৭]

আমরা মহাভারতেও দেখতে পাই যে, দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে অপমান করতে সভায় টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় দুঃশাসনকে দ্রৌপদী প্রশ্ন করেছিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির কি তাকে জুয়ায় বাজি রাখার আগে নিজেকে বাজি রেখে হেরে গিয়েছিলেন? প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, যুধিষ্ঠির যদি আগে নিজেকে জুয়ায় বাজি রেখে হেরে থাকেন তাহলে তাঁর দ্রৌপদীকে বাজি রাখার কোনো অধিকার নেই। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে, সেই সময়েও নারীদেরকে স্বামী তার নিজের সম্পত্তি মনে করতেন এবং তাকে পণ্য হিসাবে জুয়াতেও বাজি রাখতেন। নারীর সর্বপ্রধান সংজ্ঞা দুটি, তার স্থান ও ওই দুটিতে সীমাবদ্ধ থাকত। যথা - সে পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখা যায় যে - 'তস্মাদু হ স্ত্রিয়ো ভোগমেব হারযন্তে' - অর্থাৎ 'নারী সম্ভোগ আগে' (তৈ.সং ২/৩/১০/৭)

বৈদিক যুগে সমাজে ঋগ্বেদের সময় সহমরণ প্রথা একেবারে ছিল না, একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের সময় কোনোখানেই সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদের ঋষিগণের সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিধবা নারীর বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিতে চায়নি। বরঞ্চ সদ্য বিধবাদের উদ্দেশ্য করে ঋষির যে উক্তি তাতে সমাজে বিধবাদেরও যে স্থান রয়েছে তা

[৩৭] মৈত্রায়নী সং ৬/৩/৩, ৪/৬/৭, ৪/৭/৪, ১০/১০/১১.
তৈত্তিরীয় সং ৬/৫/৮/২.

বুঝিয়ে দিয়েছেন - ''হে নারী সংসারের দিকে ফিরে চল, গাত্রেস্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছে, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস, যিনি তোমার পাণি গ্রহণ করেছিলেন সেই পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল সকলই তোমার করা হয়েছে।''[৩৮]

পরবর্তী কালে সামাজিক অবস্থার বিবর্তনের ফলেই হোক বা আর্য বহির্ভূত অন্য কোনো সভ্যতার প্রভাবেই হোক প্রথম সহমরণ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। অথর্ববেদে এক জগয়গায় বলা হয়েছে - ''জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধূ হতে।''[৩৯] কিংবা ''এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে''।[৪০] কাজেই বিধবারা বেঁচে থাকলে যে সব সময় তাদের জীবন সুখের হত না। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে, 'যেন ইন্দ্রানীর মত অবিধবা হই।'[৪১] অর্থাৎ তারা যেন বিপত্তি না হয় এমন প্রার্থনা করেন। ঋগ্বেদের সময় কুপ্রথার প্রচলন না থাকায় বিধবা রমনীদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থায় বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া হত। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে দেখা যায় যে, যেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর এক নারী তার পাশে শুয়ে থাকে, তখন এক পুরুষ তথা দেবর, গুরু বা প্রাচীন দাস তার হাত ধরে জীবিতের রাজ্যে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করতে অনুরোধ করেন।[৪২] আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে স্বামীর চিতায় মৃত্যুর ইচ্ছা অণুকরণ করে তাকে সেখান থেকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনা

---

[৩৮] ঋ. সং ১০/১৮/৮ ''উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং / গতাসুমিত মুপ শেষ এহি। / হস্তগ্রাভস্য দিধিঘোস্তবেদং / পত্যুর্জনিত্ব মতি সং বভূম।''

[৩৯] অ. বে. ১৮/৩/৩২

[৪০] অ. বে. ১৮/৩/১

[৪১] তৈ. ব্রা. ৩/৭/৫/৫১

[৪২] ঋগ্বেদ ১৫/১৮/৮ 'উদীধ নার্যভি জীবলোকম্।'

হয়। বিধবাদের যে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া হত তা কেবলমাত্র তাঁর দেবর এর সাথে। তবে দেবর ছাড়াও অন্য কাউকে বিবাহ করার অধিকার ছিল বৈদিক রমনীদের। দাম্পত্য জীবনের পবিত্র আদর্শের পাশাপাশি বৈদিক সমাজে পতিতা বৃত্তির প্রচলনও ছিল। যথা - ‘‘হে ঊষা, তুমি কুলটার ন্যায় না হয়ে পতিসমীপগামিনী রমনীর ন্যায় দৃষ্ট হও’’[৪৩] প্রভৃতি মন্ত্র এর প্রমাণ।

বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের সময় আমরা মন্ত্র রচয়িত্রী নারী ঋষিদের কথা জানতে পারি। উপনিষদের যুগেও এমন বিদুষী নারীর কথা জানা যায়, যিনি প্রকাশ্য দার্শনিক আলোচনা সভায় অংশ নিতেন। ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী গার্গী এই রকম একজন নারী ঋষি। শতপথ ব্রাহ্মণের অণুবর্তী বৃহদারন্যক গ্রন্থে (৩/৮/৯) উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল তাতে কেউ পরাজিত হয়নি। আবার বৃহদারণ্যক গ্রন্থে আমরা যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু মৈত্রীয়ীর আখ্যান পাই। যিনি পার্থিব সম্পদকে অবহেলায় উপেক্ষা করে অমৃতত্ত্বলাভের জন্য বিশেষ ভাবে আগ্রহী ছিল। তিনি বলেছিলেন - ‘‘যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।’’[৪৪] অর্থাৎ যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব পাবে না তা দিয়ে আমি কি করবো? মৈত্রেয়ীর এই জিজ্ঞাসা তাঁর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের দিকটি প্রকাশ করে। এছাড়াও বৈদিক যুগে রমনীদের নৃত্য বিদ্যা, কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হত। যদিও সঙ্গীত এবং নৃত্য কলায় স্ত্রী পুরুষ উভয় অংশ নিতে পারতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে, যে দেবতারা সঙ্গীত এবং নৃত্যকলা সৃষ্টি করে আগে

---

[৪৩] যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* কলকাতা, ২০০৫, পৃ: নং ১১৭.
[৪৪] বৃহ. আ. উ. ২/৪.

বাগদেবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে[৪৫] বলা হয়েছে, যে সূতার সহায্যে সেলাই করা এবং পশমের সাহায্যে বোনা ও স্ত্রী লোকেরই কর্ম ছিল। তারা তুলো থেকে সূতো তৈরি করে এবং সেই সুতোতে রং করে বস্ত্র তৈরি করা, ঝুড়ি, দড়ি ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস তৈরির কর্মে যুক্ত ছিল। তাছাড়াও যুদ্ধ বিদ্যাতে পটয়সী নারীর উল্লেখও আমরা পেয়ে থাকি। এছাড়াও মুদ্‌গলিনী, বিশপলা, শশীয়সী প্রভৃতি যোদ্ধা রমনীদের সম্বন্ধে উল্লেখ ঋগ্বেদের মন্ত্র পাওয়া যায়।[৪৬]

এই পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমাদের মনে হয় যে, পুরুষ প্রধান সমাজ হলেও বৈদিক যুগের সমাজে নারী জাতির স্থান যথেষ্ট উন্নত ও মর্যাদাকর ছিল। তবে বৈদিক যুগে প্রথম দিকে ঋগ্বেদের সময় নারীদের যে স্বতন্ত্র উন্নত ভূমিকা আমরা দেখেছিলাম তা আবার বৈদিক যুগেরই শেষের দিকে ক্রমশঃ যে তাঁর পরিবর্তন হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে মনে হয় যে, ঋগ্বেদের প্রথমদিকে নারীদেরকে ন্যায্য মূল্য দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার, নিজের পছন্দ মত পাত্র নির্বাচনের অধিকার, বিবাহ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না প্রভৃতি বিষয়ে ঋগ্বেদের রমনীদের সমস্ত রকম সুবিধা দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু যদি গভীরভাবে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখব যে বৈদিক যুগে সমাজে

[৪৫] শ. ব্রা. ১২/৭/২১ ‘‘তৎ বা এবং স্ত্রীণাং কর্ম যদ্ উর্ণাসূত্রঃ কর্ম।’’ এখানে ‘উনা’ শব্দের অর্থ পশম এবং বয়ন কার্যের জন্য তা আবশ্যক। ‘সূত্র’ শব্দের অর্থ সূতা এবং সবীণ কর্ম জন্য সুতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

[৪৬] ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে ১০২ সূক্তে ঋষিপত্নী মৃদগলিনীর যুদ্ধ জয়ের আখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের সময় নারীদের যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, তা মুষ্টিমেয় অর্থাৎ ঋগ্বেদের রমনীদের যে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত খুব কম এবং মুষ্টিমেয় নারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষিত নারীর সংখ্যা এতই কম যে তা হাতের আঙ্গুলে গোনা যায়। তাহলে কি আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে ঋগ্বেদের সময় সকল নারীকে বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়েছিল? যদি বলা হয় যে, বৈদিক যুগে নারীদের শিক্ষিত করা হয়েছিল তাহলে শাস্ত্রে নারীদের জন্য কোনো শিক্ষালয় ছিল কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ রয়েছে কোন? বৈদিক যুগে যে মুষ্টিমেয় নারীর নাম আমরা পাই যারা বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদের বেদ পাঠের অধিকার ছিল ও উপনয়ন বিধিগুলিতে ও পুরুষদের মত অংশগ্রহণ করতে শাস্ত্রে তাদেরকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাহলে আমরা কি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, যে ঋগ্বেদ এর সময় নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিল, আর যে নামগুলি আমরা শাস্ত্রে পাই তা ব্যতিক্রম। কয়েকটি নারীদের কথা ছাড়া আর কোনো নারীর কথা শাস্ত্রে বলা হয়নি। কারণ তারা বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই আমরা কোনো ভাবেই বলতে পারিনা যে ঋগ্বেদের সময় নারীদের বেদপাঠের অধিকার বা শিক্ষার অধিকার ছিল।

বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থা ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। যার ফলে সমাজে পুরুষের আধিপত্য ছিল এবং পুরুষরা যা দোষ ত্রুটি করবে তার জন্য কোন দন্ড বা শাস্তির বিধান ছিল না, কিন্তু নারীরা যদি কোনো দোষ করে তাহলে তাদের মারাত্মক শাস্তি ছিল যে, তাদের স্বামী তাদেরকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারতেন। বৈদিক সমাজে নারীদেরকে কখনোই মূল্য দেওয়া হয়নি। বৈদিক শাস্ত্রে নারীদেরকে পণ্য হিসেবে বেচাকেনা করা হত এবং

তাদের মূল্যও নির্ধারণ করা হত। মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে এবং প্রত্যেকে যথা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মানুষ। এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার কররেলে কোনো ভাবেই নারী পণ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ক্রয় ও বিক্রয়ের কথা আমরা পাই। কুমারী অবস্থায় নারীদেরকে বেচাকেনার কথা পাই। আবার এটাও দেখা যায় যে, স্বামী তাঁর স্ত্রীকে জুয়া খেলায় পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে জুয়াতে স্ত্রীকে বাজি রাখতেন। এখন প্রশ্ন হল যে, বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থায় মানবতার দিক থেকে কি কোনো মূল্য দেওয়া হয়েছিল? মানুষকে কি মানুষ হিসাবে গণ্য করা হত অর্থাৎ আমি এখানে এটাই দেখাতে চাইছি যে, নৈতিকতার দিক থেকে কি তা সমর্থন যোগ্য?

আবার আমরা এটাও দেখতে পাই যে, নারী নিজের দেহটিকে অবাঞ্ছিত সম্ভোগ থেকে রক্ষা করার অধিকার নেই। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরা যখন খুশি তখনই যৌন সম্ভোগ করতে পারে। তাতে যদি নারী সম্মতি না থাকে তাহলে প্রথমে উপহার দিয়ে মন জয় করার চেষ্টা, আর যদি তাতে রাজি না হয় তাহলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীদেরকে বশে আনা হয় যৌন সম্ভোগ এর জন্য। এখানে নারী তার নিজের দেহের ওপর কোনো অধিকার নেই। এখানেও পুরুষ নারীকে পণ্য হিসেবে কিনতে চেয়েছেন। তাহলে কি কোনোভাবেই নারীদেরকে নৈতিক মূল্য দেওয়া হয়েছিল। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় কেবলমাত্র নারীদেরকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে দেখা হয়েছে। তাদেরকে কোনো ভাবেই নৈতিক মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা মানুষ হিসেবেও গণ্য

করা হয়নি। তাহলে কি বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতা, যৌক্তিকতা, অভিজ্ঞতা, আবেগ প্রভৃতি বিষয়গুলির কি কোনো মূল্য ছিল না।

মনুষ্যত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমান এবং প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে। তাই যদি আমরা মেনে থাকি তাহলে ঋগ্বেদের সময় কেবলমাত্র পুত্র সন্তান অধিক কাম্য বলে বিবেচিত হয়েছে কোন? শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যখন বধু সন্তান জন্ম দেয় তার আগে দুটি কলসী রাখা হত। একটি উপরে এবং অন্যটি মাটিতে। পুত্র সন্তান হলে তাকে উপরে তুলে রাখা হত, আর কন্যা সন্তান হলে তাকে মাটিতে রাখা হত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়াটা আবশ্যক এবং তার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে পুত্র সন্তান বংশধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একথাও শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পুত্র সন্তানের জন্য যজ্ঞ করা হত এবং তাতে পুত্র লাভের প্রার্থনা কথা বলা হয়েছে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বৈদিক যুগে একমাত্র পুত্র সন্তান কাম্য ছিল। আর যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে মাতাকে ত্যাগ করার বিধানও রয়েছে। নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বা বিশ্লেষণ করলে মানুষের নৈতিক মূল্যকে অস্বীকার করা হয় এবং ব্যক্তি পরিচয়কেও ক্ষুণ্ন করা হয়। ছেলে বা মেয়ে যাইহোক না কোনো আমরা যে প্রত্যেকে মানুষ এই বোধটাকে অস্বীকার করা হয়।

যদি নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবে যে বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের সর্বদা নিম্ন বা নিচু করে দেখা হত এবং নারীরাও যে সমাজের অংশ বিশেষ তা কখনোই মানা হত না। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নারী পুরুষ উভয়েরই যে গুরুত্ব রয়েছে

তা বৈদিক যুগে কি আদৌ মানা হত। বৈদিক যুগে সর্বদা নারীকে পুরুষের অধিনস্ত করে রাখা হত। নারীর সম্পত্তিতে, নিজের দেহের ওপর কোনো কিছুর ওপরই অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র নারীদের যৌন সম্ভোগের বস্তু হিসাবে দেখা হত। বৈদিক যুগে নারীর স্বাধীনতার নাম করে কেবল মাত্র নারীদেরকে পুরুষরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। বৈদিক সমাজে নারীদের অপমান করার জন্যই প্রকাশ্যে গণিকাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষিত স্বামীর কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে না পারলে স্বামী গণিকালয়ে যেতেন। পুরুষদের পত্নী, উপপত্নী থাকা সত্ত্বেও পুরুষরা যে গণিকালয়ে যেতেন তার জন্য সমাজ কোন ব্যবস্থা নেয়নি পুরুষদের জন্য। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আর যদি কোন নারীর গোপনে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করত তাহলে ঐ নারীকে ত্যাগ করার বিধান শাস্ত্রে রয়েছে। কাজেই আমরা এখানে যে নারী ও পুরুষদের জন্য যে আলাদা বিধান পাচ্ছি তার প্রধান কারণই হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবসংথার ফলে পুরুষরা সবরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে আর নারীরা সবদিক থেকেই বঞ্চিত।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই যে, নারীদের নানা করম কটুক্তি করা হয়েছিল। যথা - ‘‘ইন্দ্রশ্চিদ্ধা তদব্রবীৎ অশাসং মনঃ উতো অহ ক্রতুং লঘুম।’’ (৮/৩৩/১৮) অর্থ্যাৎ ইন্দ্র প্রকৃতই বলেছেন যে, নারীর মন অশাস্য, তারা ক্রুত অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান লঘু। কিংবা আরও বলা হয়েছে - ‘‘ন বৈ স্ত্রৈনাণি সখ্যাণি সন্তি সালাবৃকানাং হৃদয়ান্যেতা।’’(১০/৯৫/১৫) অর্থ্যাৎ স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয়না। স্ত্রীলোকের হৃদয় বুকের হৃদয়ের ন্যায়। ঋগ্বেদের পরবর্তী সময়ে সমাজের দৃষ্টিতে নারী জাতির মর্যাদা কমে আসছিল।

‘কন্যা অভিশাপ’ (তৈ. ব্রা. ৬/৩/৭/১৩), আবার আপস্তম্ব ধর্মসূত্রতে বলা হয়েছে - ‘নারীং ন হৃদয়েন প্রার্থয়েৎ’ (১/২৭৭/১-১০) অর্থাৎ হৃদয় দিয়ে নারীকে প্রার্থনা করা উচিত নয়, কিন্তু যথেচ্ছ ভোগ করার কোনও বাধা নেই। ‘নারী মিথ্যাচারিনী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিনী, সুরা বা দ্যুতক্রীড়ার মতো একটি ব্যসনমাত্র’ (মৈ. সং. ১/১০/১১, ৩/৬/৩) বলে নারীদের অভিহিত করা হয়। আবার এটাও বলা হয় যে - ‘নারী রাত্রে স্বামীকে মুগ্ধ করে নিজের ইষ্টসিদ্ধি করে নেয়’ (কাঠক সংহিতা ৩১/১) অর্থাৎ নারী ছলনাময়ী, স্বার্থপর, যেন পুরুষ উৎকৃষস্টতর জীব এসবে পুরুষের কোনো দোষ নেই। নারী অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কী ? ‘স্ত্রী, শুদ্র, কুকুর, কালপাখি এদের না দেখার কথা বলা হয়েছে, যদি দেখ তাহলে শ্রী ও পাপ, জ্যোতি ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা মিশে যাবে’ (শ. ব্রা. ১৪/১/১/৩১১) শতপথ ব্রাক্ষ্মণে এই সব বলা হয়েছে। কাজেই নারী জাতি শূদ্র, কুকুর ও কালপাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মানুষকে পশু ও জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে মানুষের যে ব্যক্তি পরিচয়ে তাকে অক্ষুণ্ন বা অস্বীকার করা হয়েছে। খাদির গৃহ্যসূত্র বলা হয়েছে যে - ‘ভক্তোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদাৎ’ (১/৪/১১) অর্থাৎ খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেবে। এর থেকে স্পষ্ট যে নারী জাতিকে এইসব অবমানকর উক্তি করা হয়েছে।

পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন তা যে সর্বত্র মানা হত না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। বৈদিক যুগেরই শেষের দিকে স্ত্রীশিক্ষা হার কমতে থাকে এবং সমস্ত দিক থেকেই নারীদের অধিকার হারায়। ধর্মসূত্র ও মনুসংহিতার যুগ থেকেই শিক্ষার এই সমুন্নত প্রতিষ্ঠা ভূমি ভাঙতে আরম্ভ করে। নারী সমাজের অবস্থা ক্রমশঃ

অবনতি হতে থাকে, এমনকি শুদ্রদের ন্যায় উচ্চবর্ণের নারীদের ও উপনয়নও বেদ পাঠের অধিকার লুপ্ত হয়ে যায়। নারী সমাজের এই ক্রম অবনতির জন্য মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ সমূহ দায়ী।

-ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ-

মনুসংহিতায় নারীর অবস্থানের দার্শনিক পর্যালোচনা

বৈদিক যুগে আমরা দেখলাম যে, ঋগ্বেদ এর সময় নারীরা যে সম্মান এবং অধিকার ভোগ করে আসছিল তা ঋগ্বেদের পরবর্তী সময় থেকে হ্রাস পেতে শুরু করলো বা তা ক্রমশঃ ভাঙ্গতে শুরু করলো। কারন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি স্তরে নারীদেরকে সর্বদা অবদমন করা হয়। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর মর্যদা ও সম্মান বিশেষ আদর্শগতভাবে দেখা হত না। ফলে ঋগ্বেদের যুগে নারীদের যেমন কিছু বিষয়ে অধিকার ছিল তা কিন্তু মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি ধর্মশাস্ত্রে হ্রাস পেয়েছে। নারীর সামাজিক অবস্থান নিম্নগামী হয়েছে এবং নারী একে একে তার সব অধিকার হারিয়েছে। ধর্মশাস্ত্র সমূহ রচিত হয় চুড়ান্ত নারীবিদ্বেষ নিয়ে। নারীর মানবিক অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় এবং তার সত্ত্বার কোনো স্বীকৃতি দেখা হয় না ধর্মশাস্ত্রে। মনুসংহিতা ভারতীয় ধর্ম সমাজ ব্যবস্থায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ। বেদ সকল যে কালের চর্চার বিষয়ছিল তার অনেক পরে ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের উৎপত্তি হয়। অনুমান করা যায় যে, কালক্রমে সমাজ বেদচর্চা থেকে দুরস্থ হয়ে পড়ার ফলে বেদের বিষয়বস্তু বোঝা দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। তার ফলে বেদোক্ত আচরণ বিধিগুলি প্রচলন করে রাখা কঠিন হয়ে পড়ার ফলে তখন বেদের মূলবিধিগুলিকে সংক্ষিপ্ত এবং সংহত রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে চারটি বেদের যা বিষয় বস্তু ছিল তা সংক্ষেপে বিন্যস্ত করে মনুসংহিতাদি ধর্মশাস্ত্র রচনা করা হয়।

আর্য হিন্দুগণের শ্রেষ্ঠত্বের আর এক পরিচয় হল স্মৃতি বা সংহিতা। আজও পর্যন্ত হিন্দু সমাজ এই স্মৃতি অনুসারে পরিচালিত হয়। এই স্মৃতি শাস্ত্রে হিন্দু সমাজের যাবতীয় বিধিনিষেধ ও অনুশাসন দেখা যায়। স্মৃতি বলার কারণ হল পূর্ব বিষয় অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানময় বেদশাস্ত্র স্মরণ করে লিখতে

হয় বলে তাকে স্মৃতি বলে। এই স্মৃতির সঙ্গে শ্রুতির অর্থাৎ বেদের সম্বন্ধ অভিন্ন বলে শাস্ত্রকার ঋষিগণ শ্রুতি এবং স্মৃতিকে ব্রাহ্মণের দুই চোক্ষের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অত্রি সংহিতাতে বলা হয়েছে - ''শ্রুতি: স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে প্রতীর্ত্তিতে।''[১] ধর্ম শব্দের অর্থ হল ধারণ করা। ধৃ + মন = ধর্ম। অর্থাৎ যে সকল আচার অনুষ্ঠান, বিধি নিষেধ পালন করে মানুষ প্রকৃতই মানুষরূপে পরিচিত লাভ করে তাকে ধর্ম্ম বলে। সেই সকল বিষয় যে সকল গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে তাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল হল বেদ। সেই জন্য বেদ বিহিত জীবনচর্য্যা এই সকল গ্রন্থে স্মরণ করা হয় বলে এই সর্ব ধর্মশাস্ত্রকে 'স্মৃতিশাস্ত্র' বলা হয়। আমাদের এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, ধর্ম এই শব্দটিকে এখানে দর্শন অর্থ না ধরে সমাজ সংগঠন পরিচালনার নিয়ম, রীতি, আচার, কর্তব্য, অকর্তব্য, বিধিনিষেধ ইত্যাদি অণুশীলনকে বোঝাতে চেয়েছি। কাজেই মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র উভয়ই।

মনুসংহিতার রচয়িতা হলেন এক বা একাধিক বেদজ্ঞ ব্যক্তি। মনুসংহিতার রচনাকাল নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে আনুমানিক ভাবে বহু বির্তকের মধ্য দিয়ে মনুসংহিতার রচনা কাল অনুমান করা যায় দুটি প্রধান অণুমান দিয়ে -

[i] মনুসংহিতা ২০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

[১] স্বামী অরুণানন্দ, *হিন্দুশাস্ত্র পরিচয়,* ভারত সেবাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ নং ৬৩.

[ii] এই গ্রন্থটি ৪০০ থেকে ৩২০ খৃষ্টপূর্ব অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। স্মরণ করা যায় যে, বেদ সমূহের বিশেষতঃ 'ঋগ্বেদ' যেটি সর্বপ্রধান বলে গৃহীত তার রচনা কাল সম্বন্ধে ও দুটি মত রয়েছে, যথা -

[i] ১৫০০ থেকে ১৪০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দের মধ্যে ও

[ii] ৪০০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দ।

কালিক বির্তকের মধ্যে প্রবেশ না করে ঋগ্বেদ ও মনুসংহিতা এই দুইটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথম মত মেনে নিলে অনুমিত ব্যবধান ১৩০০ থেকে ১৬০০ বৎসরের। আর বর্তমান সময় থেকে ব্যবধান হল -

[i] প্রথম মতানুসারে - ১৪০০ থেকে ২২০০ বছরের।

[ii] দ্বিতীয় মতানুসারে - ২৩০০ থেকে ২৪০০ বছরের।''[২]

মনুসংহিতার গুরুত্ব হল এই যে, এই একশো বছর কালের ইতিহাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে এখনও পর্যন্ত হিন্দু আইনি ব্যবস্থা মনুসংহিতা থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়ে আসছে। মনুসংহিতা হল বিধিনির্দেশক গ্রন্থ। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Prescriptive। মনুসংহিতা সম্পূর্ণ রূপেই আচারণগত বিধি-নির্দেশক শাস্ত্রগ্রন্থ। মনুসংহিতাকে বলা হয়েছে 'মানবধর্মশাস্ত্র'। ভারতীয় সমাজ সংগঠনভুক্ত মানব সমষ্টির সব নরনারী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কীভাবে চলবে, কোন্ পরিস্থিতিতে নরনারীর কী করণীয় আর কী বর্জনীয়, তাদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরাই বা তাদের জন্যে কী করবেন, কোন্ স্থলন বা অপরাধের জন্য কোন শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত এই সব ব্যাপারেই বিশদ বিধিবিধান দিয়েছেন মনু তাঁর 'মনুসংহিতা' নামক 'ধর্মশাস্ত্রে' বা 'স্মৃতিশাস্ত্রে'।

---

[২] সতী চট্টোপাধ্যায়, গৌরী ধর্মপাল, *মনুসংহিতায় ফিরে দেখা ও বেদের ঋষি,* বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ নং ২.

মনু তাঁর সময় কালে দাঁড়িয়ে নারীদের কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত বিধান দিয়েছেন মনুসংহিতাতে। শুধু নারীদের সম্পর্কে নয় পুরুষদের সম্পর্কে ও নানা বিধি বিধান দিয়েছেন। আমরা যদি নারীর জীবনকাল দেখি তাহলে দেখব যে, প্রথমে তাঁর বাল্য অবস্থা, যৌবন অবস্থা এবং বৃদ্ধা অবস্থা পাই। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এটা একবলমাত্র নারীর জীবন কাল নয়, নারী পুরুষ উভয়েরই জীবনের স্তর বা ধাপ। একজন নারী বা পুরুষের কোন অবস্থায় কি করণীয় তাঁরই বিধান দিয়েছেন মনুসংহিতাতে। আমি আমার গবেষণায় যেহেতু নারীদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি সেহেতু আমি নারীদের কে বেশি করে প্রাধান্য দেব এবং তার পাশাপাশি পুরুষদেরকে গুরুত্ব দেব। এবার আমরা দেখব যে মনু তার সময় কালে দাঁড়িয়ে নারীদের কে কি কোনো স্বাধীনতা দিয়েছেন নাকি স্বাধীনতার নাম করে তাদের প্রতি অবিচার করেছেন অথবা তাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছেন তা আমরা মনুসংহিতায় অবলম্বন করে দেখব। প্রথমে নারীর বাল্যকাল তথা নারীর শিক্ষা ব্যবস্থা দেখব।

ক। বাল্যকাল ঃ-

বাল্য অবস্থা বলতে আমরা বুঝি যে, জন্মানোর পর থেকে গৃহস্থ আশ্রম পর্যন্ত পৌছানোর সেই অবস্থাকে বলা হয় বাল্য অবস্থান বা ব্রহ্মচর্য অবস্থা এবং সেই ব্রহ্মচর্য অবস্থা শুরু হত উপনয়ন থেকে। উপনয়নের ক্ষেত্রে বিধান ছিল যে - ‘‘ব্রাহ্মন সন্তানদের ক্ষেত্রে ভূমিষ্ট হওয়া থেকে ছয় বৎসর তিন মাসের পর থেকে সাত বৎসর তিন মাস পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের উপনয়ন দেওয়া হত, একই রকম ভাবে নয় বৎসর তিন মাসের পর থেকে দশ বৎসর তিন

মাস পর্যন্ত সময়ে ক্ষত্রিয়দের উপনয় দেওয়া হত। আর দশ বৎসর তিন মাসের পর থেকে এগারো বৎসর তিন মাস পর্যন্ত সময়ে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।''[৩] উপনয়ন বলতে যে সংস্কারের দ্বারা আচার্যের সমীপে বা সামনে বালকটি নত হয় তাকে উপনয়ন বলা হয়। সাধারণত পুরুষদের উপনয়নের কথা বলা হয়েছে। নারী উপনয়ের কথা মনু তাঁর মনুসংহিতাকে কোথাও উল্লেখ করেননি। মনু নারীশিক্ষা এবং শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছেন। ফলে শতশত বৎসর শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল নারী ও শূদ্ররা। সমাজে যে অর্ধেক অংশ নারী তার বাল্য অবস্থা নিয়ে মনু বলেছেন যে, পুরুষের যেমন বেদ জ্ঞান লাভ করাটা তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা তার লক্ষ্য কিন্তু নারীদের লক্ষ্য বেদ জ্ঞান লাভ করা নয়। তার সমতুল্য হল সংসার ধর্ম পালন করা। এখানে নারী সংসার ধর্ম পালন করে বেদ জ্ঞান লাভ করে না। সংসার ধর্ম পালন করাতেই নারীর ইতি। নারী জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব হল সংসার ধর্ম পালন করা, আর পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল বেদ জ্ঞান লাভ করা এবং পুরুষ তা ধাপে ধাপে পালন করতো।

মনু তাঁর মনুসংহিতায় নারীর জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষার অধিকার তুলে দিলেন। নারীদের জন্য কোনো রূপ সংস্কারের বিধান থাকলে না শিক্ষার ক্ষেত্রে। মনুর বিধান অনুযায়ী নারীসম্পূর্ণ রূপে গৃহের অভ্যন্তরে স্থান পেল এবং নারীর ক্ষেত্রে বিবাহ করাটা হল বাধ্যতামূলক। নারীদেরকে বাধ্য করা হল স্বামী পুত্রের সেবা করে তাদের জীবনদান করতে। মনুর বিধান অনুযায়ী -

---

[৩] মানবেন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১৬, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ৩৬। (২/৩৬)

''বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ

পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহাথেহিগ্নিপরিক্রিয়া।''[৪]

অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের বিবাহবিধি বৈদিক সংস্কার বলে কথিত হল, পতি সেবা গুরুগৃহে বাস এবং গৃহকর্ম তাদের অগ্নিপরিচর্যা হল। নারীদের জন্য বিবাহ হল সবচেয়ে বড় সংস্কার। পতিসেবা তুলনীয় হয়ে গেল গুরুগৃহে বসবাস। আর নারীর গৃহকর্ম হল হোমরূপ অগ্নিপরিচর্যা। মনু যেভাবে পুরুষের নানা সংস্কারের কথা বলেছেন কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে কোনো সংস্কারের কথা বলেননি। আর যে সকল সংস্কার স্ত্রীলোকের শরীরের সংস্কার জন্য ছিল তা থাকলেও যথাক্রমে আমন্ত্রক করনীয় সংস্কার বলে গণ্য হল। যথা -

''অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ

সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্।''[৫]

অর্থাৎ নারীদের জন্যে সংস্কারের বিধান থাকলেও তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নারীর জাতধর্ম সংস্কার অমন্ত্রক হবে কেন? হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিষয়ে বলেছেন যে -

''Peculiarity of psychophysical Constitition and her special qualifications and vocations prevent veda mantras being used successfully.''[৬]

নারীর শরীরী ভাষা ও দেহগঠনের পক্ষে কী সুন্দর ব্যাখ্যা নারীকে অমন্ত্রক করার জন্য বা করে তোলার জন্য।

---

[৪] মনুসংহিতা - ২/৬৭

[৫] মনুসংহিতা - ২/৬৬

[৬] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪২, পৃঃ নং ১৫০.

মনুসংহিতায় নারীদের বেদপাঠের অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়। মনু বলেন -

''নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতি।''[৭]

অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের মন্ত্রসহকারে জাতকর্মাদি সংস্কার নেই এটা ধর্মবিহিত। নারীরা ধর্মজ্ঞ নয়, মন্ত্রহীন এবং মিথার ন্যায় অশুভ এটাই শাস্ত্রীয় নিয়ম। এই শ্লোকটিকে পঞ্চানন তর্করত্ন যেভাবে অনুবাদ করেছেন তা হল -

''শাস্ত্রোক্তবিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্ম্মাদ্দি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয়না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে নারীদের অধিকার নেই এবং কোন মন্ত্র উচ্চারণে ইহাদের অধিকার নাই এজন ইহারা নিতান্তহীন ও অপদার্থ।''[৮] কাজেই মনু নারীদেরকে মিথ্যার ন্যায় অশুভ এবং অধর্মজ্ঞ মন্ত্রহীন বলে চিহ্নিত করেছেন। শুধু বেদ পাঠে নয়, অন্যান্য সব ধর্মশাস্ত্রে পাঠ করা নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং সর্বদিক থেকে নারীর শিক্ষার পথ বন্ধ করে দিলেন। যাতে নারীর মানবিক বিকাশের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। মনু বলেন নারীরা গৃহস্থলীর কাজে নিপুন হবে এবং পতি সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, স্বামীর সঙ্গে ছাড়া মেয়েদের জন্য কোনো বিশেষ যজ্ঞাহুতি ব্যবস্থা নেই। আবার স্বামীর মত ছাড়া কোনো ব্রত উপবাস করতে পারবে না স্ত্রী। কাজেই মেয়েদের কোনো ভাবেই মনু স্বাধীনতা দেননি। নারী মানে সর্বদা সে কারোও উপর নির্ভরশীল থাকবে। মনু নারীদেরকে গৃহ বন্দিনী করে তুলেছেন। গৃহই হল নারীর জন্য উপযুক্ত স্থান। গৃহের বাইরে নারীর কোন ভূমিকা নেই। নারী মানেই তাকে সংসারের নিয়ম কানুন মানতে হবে, গৃহস্থলীর কাজে নিপুন হতে হবে এবং স্ত্রীর কাছে

[৭] মনু সংহিতা - ৯/১৮.
[৮] পঞ্চানন তর্করত্ন, *মনুসংহিতা,* পৃঃ নং ২৫০.

স্বামী দেবতা স্বরূপ। যদি স্বামীর সেবা যত্ন করে তবে নারী স্বর্গলাভ করতে পারবে। এইভাবে মনু নারীদের শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত করে এবং গৃহের কাজ কর্মকে স্ত্রীশিক্ষা বলে অভিহিত করেন। মনু নারীদেরকে স্ত্রী হওয়াটাকে সার কথা বলেন।

খ। যৌবন অবস্থা ঃ-

নারীর স্ত্রীশিক্ষা শেষ হচ্ছে তার গৃহ শিক্ষা দিয়ে। এবং গৃহশিক্ষার ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি যে তার মধ্যে নারীদের একটাই সংস্কার আছে, সেটা হল বিবাহ সংস্কার। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেকগুলি সংস্কার রয়েছে এবং সেই সংস্কার গুলো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরুষ পালন করে চলেছে। নানারকম সংস্কারের মধ্যে যৌবন অবস্থাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্নান সমাবর্তন নামে একটি সংস্কার রয়েছে। এইখান থেকে তার ব্রহ্মচর্য অবস্থান শেষ হয়ে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে এবং তারপর বিবাহ নামক সংস্কারে উপনীত হয়। নারীদের ক্ষেত্রে এরকম কোনো সংস্কার ছিল না। ফলে নারীদের কোনরকম সংস্কার বিধি না থাকায় তারা বাল্যকাল থেকেই গৃহস্থ ধর্মপালন করতো। নারীদের জীবন কালের দ্বিতীয় স্তর বা ধাপ হল যৌবনাবস্থা। প্রথমেই মনু বলেছেন নারীরা যেহেতু নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না তাই নারীদের নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নেই। তারা কারোও না কারোও ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। মনু বলেছেন যে -

''পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষিত যৌবনে
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।''[৯]

[৯] মনুসংহিতা - ৯/৩.

অর্থাৎ নারী বাল্যকালে পিতার অধিনে, যৌবনে পতির অধিনে এবং বাধ্যকে পুত্রের অধিনে থাকবে। নারীদের নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নেই বা স্ত্রীলোক স্বাধীনতা পাওয়া যোগ্য নয়। মনু আরও বলেছেন -

''কালেহদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ
মৃতে ভর্তরি পুত্রস্ত বাচ্যে মাতুররক্ষিতা।''[১০]

অর্থাৎ যৌবন অবস্থায় তথা বিবাহ যোগ্য কালে কন্যা সম্প্রদান না করলে পিতা, ঋতুকালে স্ত্রীগমন না করলে পতি এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে মাতার রক্ষণাবেক্ষন না করলে পুত্র নিন্দনীয় হয়। কাজেই মনু এখানে পুরুষদের যে কর্তব্য তা উল্লেখ করতে চেয়েছেন এবং তার সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করেছেন যে স্ত্রীলোক স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। যেকোনো অবস্থাতেই স্ত্রীলোক কারোও না করোও ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

মনু তাঁর মনুসংহিতায় বিবাহ নামক সংস্কারে কিরকম কন্যাকে বিবাহ করা উচিত এবং কিরকম কন্যাকে বিবাহ করা অনুচিত তারই বিধান দিয়েছেন। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, গুরুর অনুমিতি নিয়ে যথা বিধি ব্রতস্নান ও সমাবর্তনের পর ব্রহ্মচারী বিবাহ করতে পারবেন। যথা -

''গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি
উদ্বহেত দ্বিজোভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণন্বিতাম্''।[১১]

অর্থাৎ গুরুর অনুমতি লাভ করে ব্রতস্নান সংস্কার বিশেষ করে যথাবিধি সমাবর্তনের পর দ্বিজ ব্রহ্মচারী সুলক্ষণসম্পন্না সজাতীয় ভার্যাকে বিবাহ করবে। আর সমাবর্তন (Convocation) শব্দের অর্থ হল - 'বেদ অধ্যায়নের

---

[১০] মনুসংহিতা - ৯/৪.
[১১] মনুসংহিতা - ৩/৪.

পর গুরুকুল থেকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন’। আমাদের মনে রাখতে হবে মনু এখানে সজাতীয়া কন্যা বলতে নিজের জাতের কন্যার কথা বলেছেন এবং সুলক্ষণা বলতে যার মধ্যে কোনো অশুভ লক্ষণ নেই। অর্থাৎ যার মধ্যে শুভ লক্ষণ থাকে তাকে সুলক্ষণা বলে এবং সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করার কথা বলেছেন। এছাড়া ও মনু নারীর বিবাহের বয়স পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যথা -

‘‘ত্রিংশব্দর্ষোদ্বহেৎ কন্যাঃ হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম

এ্যষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ।’’[১২]

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ বারো বৎসর বয়সের মনোমত কন্যাকে বিবাহ করবে। অথবা চব্বিশ বছর বয়সের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। এদ্বারা বিবাহযোগ্য কাল প্রদর্শিত হল মাত্র। তিনগুনের বেশী বয়সের পুরুষ একগুন বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করবে, এরকম বেশী বয়সে বিবাহ করলে ধর্ম নষ্ট হয়। মনু কন্যার নিম্নতম বিবাহের বয়স আট বছরের কম হলেও তাকে সম্প্রদান করার বিধান ও দিয়েছেন। যথা -

‘‘উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ

অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈঅ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি।’’[১৩]

অর্থাৎ কন্যাবিবাহযোগ্য না হলে তাকে উৎকৃষ্ট স্বরূপ ও সুবর্ন বরের কাছে বিধি অনুসারে সম্প্রদান করার কথা বলেছেন। মনু তাঁর মনুসংহিতায় কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয় তারই বিধান দিয়েছেন। যথা -

‘‘নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গী ন রোগিণীম্

নালোমিকং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্।’’[১৪](৩/৮) এবং

---

[১২] মনুসংহিতা - ৯/৯৪.

[১৩] মনুসংহিতা - ৯/৮৮.

''নৰ্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপবর্তনামিকাম্
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্।''[১৫](৩/৯) তাছাড়াও -
''যস্যাস্ত ন ভবেদ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা (বৈ) পিতা
নোপথচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রকাধর্মশঙ্কয়া।''[১৬](৩/১১)

অর্থাৎ কপিলা কন্যাকে যার কেশসমূহ তামাটে কিংবা কনকবর্ণ তাদের বিবাহ করতে বারণ করা হয়েছে। যে কন্যার অধিক অঙ্গ আছে, যে নারীর নানা রোগ রয়েছে, যে ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত, যার শরীরে লোম রয়েছে, যে নারী বাচাল অর্থাৎ যেখানে খুব কম কথা বলা উচিত সেখানে যে বেশি কর্কশ কথা বলে, যে নারীর চোখ পিঙ্গল বর্ণের সেই সমস্ত নারীকে বিবাহ করা উচিত নয়। আবার যে নারীর নাম নক্ষত্রবাচক, বৃক্ষবাচক এবং নদীবাচক, অন্ত্যজজাতিবোধক, পর্বতবাচক, পক্ষীবাচক, সাপবোধক, ভৃত্যবাচক, ভয়বোধক নামযুক্ত নারীদের বিবাহ করা উচিত নয়। তাছাড়া ও বলা হয়েছে যে কন্যার ভ্রাতা নেই বা পিতা অজ্ঞাত, বিজ্ঞ ব্যক্তি পুত্রিকা ধর্মশঙ্কায় তাকে বিবাহ করা উচিত নয়। কাজেই মনু এখানে কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয় তাই বিধি বিধান উল্লেখ করেছেন।

মনু এবার কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত তা উল্লেখ করেছেন -

''অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্।''[১৭]

---

[১৪] মনুসংহিতা - ৩/৮.
[১৫] মনুসংহিতা - ৩/৯.
[১৬] মনুসংহিতা - ৩/১১.
[১৭] মনুসংহিতা - ৩/১০.

অর্থাৎ যে নারীর কোন অঙ্গ বিকলাঙ্গ নেই, যার নাম শ্রুতিমধুর সেই নারীকে বিবাহ করার কথা বলেন। এছাড়াও যার গতি ভঙ্গী হংস বা হস্তীর মতো অর্থাৎ বিলাসযুক্ত ও মন্থরগমনযুক্তা, যার লোম, কেশ ও দন্ড নাতিদীর্ঘ এবং যার অঙ্গসমূহ মৃদু অর্থাৎ সুখস্পর্শ অর্থাৎ যে নারী কোমলাঙ্গী এই রকম নারীকেই বিবাহ করার কথা মনু বলেছেন। মনু এখানে বার বার করে কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত এবং কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয় কেবল তারই বিধান দিয়েছেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিধান দেননি। মনু এমনও বলেছেন যে পতি দুশ্চরিত্র কামুক ও গুনহীন হলেও তাকে পতি রূপে গণ্য করতে হবে। তাকে দেবতার ন্যায় সেবা করতে হবে। যথা -

''বিশীল ঃ কামবৃত্তো বা গুণৈ বা পরিবর্জিতঃ

উপচর্য ঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।''[১৮]

মনু আরোও বলেছেন যে, যদি কোনো নারীর শারীরিক ত্রুটি থাকে তাহলে সেই নারীর ক্ষেত্রে পাত্র পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। উপযুক্ত পাত্রীর শুভলক্ষণ বিষয়ে যেখানে মনু এত বিধান দিয়েছেন, সেখানে প্রতিবন্ধী কিংবা রোগগ্রস্তা নারীকে কোনো ভাবেই বিবাহ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই মনু বলেছেন কন্যাকে উপযুক্ত বয়সে সম্প্রদান না করলে কন্যা নিজেই তার পতি নির্বাচন করতে পারবে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে -

''ত্রীনি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্যৃতুমতী সতী

উর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্''।[১৯]

---

[১৮] মনুসংহিতা - ৫/১৫৪.
[১৯] মনুসংহিতা - ৯/২০.

অর্থাৎ কুমারী কন্যা ঋতুমতী হলে তিন বৎসর পর্যন্ত গুণবান্ বরের অপেক্ষা করে ঐ সময় পার হয়ে গেলে অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে পিতা বিবাহ না দিলে কন্যা নিজের পছন্দ মতো পাত্রের সঙ্গে বিবাহ করবে। মনু এই রকম বিধান দিলে নারীদের জন্য যে ঋতুমতী হওয়ার তিন বৎসর পর যদি পিতা ঐ নারীকে বিবাহ দিতে না পারে তাহলে ঐ নারী নিজের পছন্দ মত পাত্রকে বিয়ে করবে। তাতে কন্যার কোন পাপ হবে না এবং যে পাত্র কে বিবাহ করবে তারও কোনো পাপ হবে না। কিন্তু সেই কন্যার জন্য অন্য শাস্তি রাখলেন। মনু বলেন যে -

''অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ম্বরা
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনঃ স্যাদ্ যদি তৎ হরেৎ।''[২০]

অর্থাৎ স্বয়ংবরা কন্যা পিতা মাতা ও ভ্রাতার দেওয়া অলংকার গ্রহণ করবে না। যদি করে তাহলে সে চোর বলে গণ্য হয়। এখন প্রশ্ন হল যে এ কেমন বিচার মনু নারীদের প্রতি? তিনি পতি নির্বাচনের অধিকার দিলেন নারীদের, আবার তাকে বঞ্চিত করলেন তার প্রাপ্য স্ত্রীধন থেকে। কাজেই মনু যে সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন সেই সমাজ ব্যবস্থা ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং সেখানে পুরুষের আধিপত্য ছিল প্রবল ভাবে। পুরুষরা যা বলবে তাই সঠিক, নারীদের কোনো অধিকারই পুরুষদের কাছে প্রধান্য পেত না।

মনু বলেছেন যে, যদি বিবাহের পর স্বামী উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, নির্বীজ, পাপ রোগগ্রস্ত স্বামীকে ত্যাগ করলে স্ত্রী ত্যাজা হয় না এবং সে স্ত্রীধন থেকে বঞ্চিত হয় না। যথা -

''উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণস্

[২০] মনুসংহিতা - ৯/৯২.

ন ত্যাগোহস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্তনম্।''[২১]

আবার মনু একথা বলেছেন যে -

''জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্যাং যবীয়ান্ বাহগ্রজস্ত্রিয়ম্

পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি।''[২২]

অর্থাৎ প্রমত্তযুক্ত অবস্থায় বা আপদ্‌কাল ভিন্ন হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের স্ত্রীতে বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীতে গমন করলে তারা উভয়েই পতিত হয়। মনু এখানে বলেছেন যে কোন রূপ অবস্থায় যদি কেহ অন্যের স্ত্রী গমন করে তাহলে তারা পতিত হয়। তারমানে মনু এখানে সরাসরি ভাবে পুরুষদের বা নারীদের ব্যভিচার এর বিরুদ্ধে বিধান দিয়েছেন। মনু একথাও বলেছেন যে -

''যস্তু তৎ কারয়েন্মোহাৎ স্বাজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া

যথা ব্রাহ্মণচন্ডালঃ পূর্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ।''[২৩]

অর্থাৎ স্বজাতীয়া স্ত্রী বর্তমান থাকায় যে লোক মোহবশতঃ অন্যহীন জাতীয়া স্ত্রীকে দিয়ে ঐসব কাজ করায় সে লোককে ব্রাহ্মণ চন্ডাল রূপে গন্য করা হয় অর্থাৎ যদি সেই লোক ব্রাহ্মন ও হয় তাহলে ও সে চন্ডাল রূপে গন্য হয়, একথা কথা পূর্বসূরিগণ বলেছেন। মনু তাঁর মনুসংহিতায় পুরুষদের ক্ষেত্রেও নানারকম বিধি নিষেধের কথা বলেছেন। তিনি কেবলমাত্র নারীদের ক্ষেত্রে নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রে ও নানা বিধান দিয়েছে। মনু নারীদের ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধ করে তাদের উপনয়ন সংস্কার এর কথা বলেছেন। অর্থাৎ নারীদের উপনয়ন সংস্কার হল বিবাহ করা। পুরুষদের ক্ষেত্রে বেদ অধ্যায়ন করা

---

[২১] মনুসংহিতা - ৯/৭৯.
[২২] মনুসংহিতা - ৯/৮৭.
[২৩] মনুসংহিতা - ৯/৫৮.

মানেই হল বৈদিক সংস্কার, যা উপনয়ন নামে প্রসিদ্ধ কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে তা বিবাহ নামে পরিচিত। এখান থেকে স্বভাবত যে প্রশ্নটা উঠে আসে সেটা হল বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো রূপভাবে মনু কি বর্ণ প্রথা কে প্রাধান্য দেবে? অর্থাৎ মনু কিরূপ বর্ণের নারীদের বিবাহ করার কথা বলেন?

আমরা জানি যে চার প্রকার বর্ণ রয়েছে। যথা ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মনু এই বর্ণ ভেদের জন্য বলেছেন যে কোন বর্ণের মানুষ কোন বর্ণের নারীদের বিবাহ করতে পারবে তারই বিধান দিয়েছেন। মনু বলেছেন যে -

''শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ।''[২৪]

অর্থাৎ শূদ্র বর্ণের মানুষ কেবলমাত্র শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে, তারা অন্য কোনো বর্ণের নারীকে বিবাহ করতে পারবে না। তেমনি আবার বৈশ্য বর্ণের মানুষ কেবলমাত্র শূদ্র এবং বৈশ্য বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে। এরা ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না। কারণ এরা হল নিম্নবর্ণ, তাই উচ্চবর্ণের কন্যাদের বিবাহ করতে পারবে না। ক্ষত্রিয় বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি ব্যবস্থা, এরা শূত্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় কন্যাদের বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না। আবার ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে ও এরা আগের তিন বর্ণের এবং নিজ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে। আমাদের এখানে যেটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে সে মনু এই যে চারটি বর্ণের ক্ষেত্রে যে বিবাহের বিধি বিধান দিলেন তা কেবলমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নারীদের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো বিধান ছিল না। মনু বলেছেন উচ্চবর্ণের

---

[২৪] মনুসংহিতা - ৩/১৩.

পুরুষ নিম্নবর্নের নারীকে বিবাহ করতে পারবে, কিন্তু উচ্চবর্ণের নারী নিম্ন বর্ণের পুরুষকে বিবাহ করতে পারবেন না। তার মানে মনু এখানে নারীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছেন। আমরা এখানে অন্য আর এক ধরণের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি যেখানে পুরুষ কেবলমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এই বিধি বিধান দিয়েছেন। যেখানে নারীদের কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। মনু এখানে পুরুষদের কে বলশালী করে দেখিয়েছেন। কেননা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষই শ্রেষ্ঠ। তাই পুরুষরা যা খুশি করতে পারে, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো বিধান ছিল না যে, উচ্চবর্ণের নারী নিম্নবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না, কিন্তু উচ্চবর্নের পুরুষদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল।

আমরা আরোও এক ধরণের বর্ণ সঙ্কর ব্যবস্থা দেখতে পাই, যেখানে মনু বলেছেন যে -

''হীনজাতি স্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্।''[২৫]

অর্থাৎ যদি ব্রাহ্মন বর্নের মানুষ অন্য বর্নের কন্যাকে বিবাহ করে এবং সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় নিম্নবর্নের পতিত হয়, তার আর ব্রাহ্মনত্ব থাকে না. আবার -

''শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণাদেব হীয়তে।''[২৬]

---

[২৫] মনুসংহিতা ৩/১৫
[২৬] মনুসংহিতা - ৩/১৭.

যদি কেউ তাঁর নিজের সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করে অর্থাৎ নিজ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ না করে অন্য বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করে এবং সেই স্ত্রীর যদি সন্তান উৎপাদন করে তাহলে তার ও ব্রাহ্মণ্যত্ব আর থাকে না এবং সকলের কাছে নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। কাজেই মনু যে বিবাহের কথা বলেছেন যে কিরকম কন্যাকে বিবাহ করা উচিত এবং কীরকম কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয়, কোন বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করা উচিত এবং কোন বর্ণের কন্যাদের বিবাহ করা উচিত নয় তারই বিধান দিয়েছেন মনুসংহিতায়। মনু যে বিবাহের কথা বলেছেন এই বিবাহের মধ্যে আবার এটাও দেখা যায়, পতি ও পত্নীর সংখ্যা অনুসারে বিবাহের কয়েকটি ভাগ দেখা যায়। যথা ‘‘এক কালে মাত্র এক জনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপন করাকে একক বিবাহ বা একগামিতা Monogamy বলে। অন্যদিকে পুরুষ বা নারী এক কালে একাধিক লোকের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করলে তাকে বহুগামীতা বা বহুবিবাহ palygamy বলে। আর বহুগামিতার আর একটি প্রকার হল যখন একই স্ত্রীলোক একই কালে বহুপতি গ্রহণ করে তাকে ভর্তৃকত্ব বা Polyandry বলা হয়। এছাড়াও যখন একজন পুরুষ এক সঙ্গে বহুপত্নী গ্রহণ করেন তাকে বহুপত্নীকত্ব Polygyny বলা হয়।’’[২৭]

মনু বলেছেন যে, একজন পুরুষ বহু বিবাহ করতে পারে, কিন্তু একজন নারী বহু বিবাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে মনু নারীদের কোনো ভাবেই স্বাধীনতা দেয়নি বরঞ্চ মনু সর্বক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা সীমিত করে দিয়েছেন। মনু বলেছেন যে -

[২৭] উমা সেনাপতি, *বিবাহ ও পরিবার*, বাক্ প্রতিমা কতৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ নং ২৩-২৪.

''অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্
বিষয়েষু চ সজ্জন্তঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে।''[২৮]

অর্থাৎ নারী সারাজীবন পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে বেঁচে থাকবে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়। নারী মানেই সে গৃহস্থলীর কাজে নিপুন হবে, পতি সেবাপরায়ণ হবে। কিন্তু মনু বার বার করে বলেছেন যে, নারীকে বাড়িতে কোনো কিছু করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। মনু বলেছেন -

''বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা
ন স্বাতন্ত্র্যেন কর্তব্যঃ কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেস্বপি।''[২৯]

অর্থাৎ স্ত্রীলোক বালিকা হোক বা যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা হোক সে গৃহের মধ্যে কোনো কাজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া করতে পারবে না। তার মানে মনু এখানে নারীর যে গৃহস্থের ক্রিয়া কর্ম করার জন্য যতটা স্বাধীনতা থাকা দরকার তা ও অস্বীকার করেছেন। মনু বারবার করে নারীর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছেন। নারীর গতি হল পিতা, পতি ও পুত্রের অধীনে থাকবে। বিবাহে নারীর সম্মতির কোনো প্রয়োজন নেই। যার হাতে তাকে তুলে দেওয়া হবে তাকেই সারাজীবন নিয়ে চলতে হবে, তাতেই নারীর মঙ্গল। মনু আরোও বলেছেন যে -

''নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।''[৩০]

---

[২৮] মনুসংহিতা - ৯/২.
[২৯] মনুসংহিতা - ৫/ ১৪৭.
[৩০] মনুসংহিতা - ৫/ ১৫৫.

অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে স্ত্রীলোকের কোনো যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নেই। পতিসেবা দ্বারাই নারী স্বর্গে পূজিত হন। এটা দ্বারাও মনু বোঝাতে চেয়েছেন যে, স্ত্রীলোকের কর্মই হল পতি সেবাপরায়ন হওয়া, পতি যেভাবে চায় সেইভাবেই পতির মন জয় করে চলতে হবে। যদি পতির কোনো গুণ ও না থাকে তবুও সাধ্বী স্ত্রী পতির সেবা করবে। পতি যেমনই হোক তথা কামবৃত্তই হোক কিংবা একেবারে গুণ বর্জিত হোক সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য হল সর্বদা দেবতার ন্যায় পতির সেবা করা। পতি সেবার মধ্য দিয়ে সাধ্বী স্ত্রী স্বর্গে বিরাজমান হবে। এই শ্লোকের ওপর সুকুমারী ভট্টাচার্যের মন্তব্য হল -

''নারীর হীনত্ব প্রতিপাদনে দৃঢ় পরিকর মনু বলেন, সর্বগুণহীন পুরুষ ও সর্বগুণযুক্তা নারীর পূজ্যা। এই উক্তি হল একটি উপপাদ্য মেনে নিয়েই, পুরুষ বলেই পুরুষের উৎকর্ষ, নারী বলেই ব্যক্তিগত গুণ যোগ্যতা বিচারের কোন মানদন্ড এখানে স্বীকৃত নয়।''[৩১]

মনু স্ত্রীলোকদের যে কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে স্বাধী স্ত্রী যদি পতিলোক প্রাপ্ত হতে চায় তাহলে যে ব্যক্তির জলপান করবে তার কোনো অপ্রিয় কর্ম করা চলবে না। তাঁর জীবিত কালে হোক অথবা মৃত্যুর পরে হোক। এখানে মনু বার বার করে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, নারীদের কর্তব্য হল সংসারের কাজ কর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখা এবং পতির শুশ্রূষা যাতে হয় সেভাবে সেবাপরায়ন করা স্ত্রী লোকের প্রধান কর্তব্য এবং স্ত্রীলোক যাতে স্বামী সেবাপরায়ণ হয় তার জন্য তাদেরকে লোকনিন্দার ভয় ও ধর্মের ভয় দেখিয়েছেন। মনু বলেছেন -

''পতিং যা নাতিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা

---

[৩১] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *বিবাহ প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. নং ২০.

সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।''[৩২]

অর্থাৎ যদি কায় মনবাক্যে পতির চিন্তা করে এবং তার ক্ষতির চিন্তা না করে তাহলে সেই রমনী সাধবা নামে পরিচিত হন এবং তিনি যথার্থ স্ত্রী বা নারী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। নারী যদি নিজের স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্য পুরুষের চিন্তা করে তাহলে লোকসমাজে তাকে নিন্দীত হতে হয়। অর্থাৎ যে নারী স্বামীর প্রতি ব্যভিচারিনী হয়ে অন্য পুরুষের সাথে সম্ভোগ করে ইহলোকে সে নিন্দীত হয় এবং জন্মান্তরে শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও নানারকম ক্ষতিকারক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। যথা মনুর ভাষায় -

''ব্যভিচারাত্তু ভর্তু ঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতম্

শৃগালযোনিঞ্চাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে।''[৩৩]

মনু আরও বলেন যে - নারীদের যেমন নানাবিধ কর্তব্য রয়েছে তেমনি পুরুষেরও কিছু কর্তব্য রয়েছে। মনু নারী ও পুরুষের উভয়েরই কিছু কর্তব্য বিধি বিধান দিয়েছেন। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে যে কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলি আসলে পুরুষ যাতে তার সম্পত্তি বা ধন নিশ্চিত ভাবে নিজের বংশের হাতে দিয়ে যেতে পারে, অন্য কাউকে দিতে না হয় তার জন্যই কিছু কর্তব্য বিধান রয়েছে পুরুষদের ক্ষেত্রে। তাই মনু বলেছেন -

''যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্

তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নত।''[৩৪]

---

[৩২] মনুসংহিতা - ৯/২৯.
[৩৩] মনুসংহিতা - ৯/৩০.
[৩৪] মনুসংহিতা ৯/৯

অর্থাৎ স্ত্রীলোক যেমন পুরুষকে ভজনা করবে তেমন পুত্র সন্তান প্রসব করবে। কাজেই সন্তানের বিশুদ্ধির জন্য স্ত্রীলোকদের সযত্নে রাখা পুরুষের কর্তব্য। আরও বলা হয়েছে যে -

''স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ

স্বঞ্চ ধর্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষণ্ হি রক্ষতি।''[৩৫]

পুরুষদের কর্তব্য হল স্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব পালন করে তাকে সমস্তদিক থেকে রক্ষা করে পুরুষ নিজের সন্তান, চরিত্র, বংশ, নিজেকে এবং নিজের ধর্মকে রক্ষা করে। মানুষের বংশ পরিচয়কে কেন্দ্র করে একজন মানুষের ধর্ম পালিত হয়। কাজেই পুরুষদের উচিত তাঁর স্ত্রী সমস্ত রকম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা। কাজেই মনু কেবলমাত্র স্ত্রী কর্তব্যের কথা বলেননি তিনি পুরুষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলেছেন এবং বহু বিষয়ে সচেতনা এবং সাবধানতার কথা ও বলেছেন। মনু আরও বলেছেন যে - স্ত্রীলোকদের কেউ বলপূর্বক বা তাড়নাদির দ্বারা রক্ষা করতে পারবে না। তাদের রক্ষার উপায়গুলি নিজেদেরকে জানতে হবে। মনু বলেছেন -

''ন কশ্চিচদ্যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্

এতৈরুপায়যোগৈস্ত শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্।।

অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তস্তকারিভিঃ

আত্মানমাত্মনা যাস্ত রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।।''[৩৬]

অর্থাৎ মনু বলেছেন যে, নারীকে রক্ষা করা পতির কর্তব্য ঠিকই কিন্তু রমনীর আত্মরক্ষা নিজেকে নিজেই রক্ষা করা ও নিজের যত্ন নিজেই নেওয়া দরকার। কারণ যে রমনী নিজে আত্মরক্ষা করতে যত্নবতী না হয় তাকে

---

[৩৫] মনুসংহিতা ৯/৭

[৩৬] মনুসংহিতা - ৯/ ১০, ১২.

বিজ্ঞ পুরুষ দ্বারা গৃহে আবদ্ধ করে রাখলেও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যারা আত্মরক্ষায় যত্নশীল কেউ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ না করলেও তারা সুরক্ষিত রাখে নিজেদেরকে। মনু শুধুমাত্র নারীদের সতীত্ব বিধি, ব্যভিচার এর বিষয়েই বলেন নি, তিনি পুরুষের বিচ্যুতি, পরস্ত্রীগমন পাপ বা ব্যভিচারের বিষয়েও নানাবিধ সতর্কতার কথা বলেছেন। মনুর মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ব্যভিচারই সমানভাবে নিন্দনীয়। পুরুষের ভোগ সংযমের কথা বলতে গিয়ে মনু বলেছেন যে, পরস্ত্রী গমন থেকেই বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়, বর্ণসঙ্কর থেকে হয় অধর্ম এবং অধর্ম থেকে হয় সর্বনাশ। যথা -

''তৎসমুখো হিলোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ
যেন মূলহরোহধর্ম্মঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে।''

এছাড়াও মনু একথাও বলেছেন যে, পুরুষ পূর্ব থেকেই পরদার দোষে দোষী বলে পরিচিত এবং যদি কোনো বিশেষ কারণে নির্জনে কোনো পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্ভোগ করে তবে তা দন্ডনীয় ও নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করে বলেছেন -

''পরস্য পত্ন্যা পুরুষঃ সম্ভাষাং যোজয়ন রহঃ
পূর্ব্বমাক্ষারিতো দোষৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ পূর্বেসাহসম্।''

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা আর এক ধরণের বিষয় লক্ষ্য করি যে, মনু নারীকে নিজের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে। মনুর কাছে নারী মানেই তাঁর স্বামীর সম্পত্তি, যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব কীভাবে হল? তখন তাঁর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি যে, পিতৃতন্ত্র কোনো একটি মতাদর্শ নয়, এটি নানারকম ভাবে হয়ে থাকে। আবার পিতৃতন্ত্র কোনো একটি সরলীকৃত প্রক্রিয়া নয়, সমাজের শ্রেণি এবং স্তরভেদ অথবা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্নভাবে নারীর ওপরে পুরুষের আধিপত্যকে বোঝানোর

জন্য পিতৃতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনু এখানে নারীকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মনু এখানে নারী জাতিকে ক্ষেত্র স্বরূপ এবং পুরুষ জাতিকে বীজ স্বরূপ বলেছেন। তথা -

''ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূত: স্মৃত: পুমাউস্ক

ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভব: সর্বদোহিণাম্।''[৩৭]

অর্থাৎ মনু নারীকে শস্যক্ষেতের মতো, আর পুরুষকে শস্যের বীজস্বরূপ বলেছেন। এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে সকল প্রাণীর উৎপত্তি। নারী ও পুরুষের মিলনের ফলস্বরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কাজেই মনু বলেছেন যে এই ক্ষেত্রকে রক্ষনাবেক্ষণ করার দায়িত্ব হল পুরুষের এবং তার সাথে সাথে মনু এটাও বলেছেন যে, ক্ষেত্র ও বীজের মধ্যে বীজকে উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কারণ সর্বত্র সন্তান বীজের লক্ষণ যুক্ত হয়ে থাকে। তথা -

''বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে

সর্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিত।''[৩৮]

মনু এখানে নিয়োগ পদ্ধতির কথা বলেছেন। যথা -

''দেবরাদ্বা সপিন্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়া

প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষায়ে।''[৩৯]

অর্থ্যাৎ নিয়োগ পদ্ধতি বলতে যদি কোনো নারীর বা স্ত্রীর স্বামী দ্বারা সন্তান লাভ করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে মনু বলেন যে, স্বামীর পরিবর্তে দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন ক্রিয়া হতে পারে। আর যদি দেবর বা স্বামীর

---

[৩৭] মনুসংহিতা - ৯/৩৩.
[৩৮] মনুসংহিতা - ৯/৩৫.
[৩৯] মনুসংহিতা - ৯/৫৯.

ভাই না থাকে তাহলে সেই জায়গায় তাঁর স্বামীর আত্মীয় সজন কারোর দ্বারা সেই ক্রিয়া হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বা নিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে তবেই নিয়োগ পদ্ধতি হতে পারে। আরও বলা হয়েছে যে একবার মাত্র মিলন হবে এবং সন্তান প্রাপ্তির পর তারা আলাদা হয়ে খাবে এবং তাদের তখন সম্পর্ক হবে পুত্রবধূ এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো নারী কারোর অনুমতি না নিয়ে নিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সন্তান লাভ করে তাহলে তাকে লোকসমাজে নিন্দনীয় বা ব্যভিচারী হতে হয়। যথা -

''নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্তেয়াতান্তু কামত:
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নষাগ গুরুতল্পগৌ।''[৪০]

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিয়োগের জন্য নিযুক্ত হয়ে নিয়ম লক্ষণ পূর্বক কাম বশে আচরণ করে তারা উভয়ই পতিত হয় এবং ব্যভিচারী হয় এবং আরো বলা হয়েছে যে -

''নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জনা ধর্মং হন্যুঃ সনাতনম্।''[৪১]

অর্থাৎ বিধবাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো নারী দেবর দ্বারা নিয়োগ পদ্ধতি না হয়ে অন্য জন কর্তৃক বা অন্যজনের দ্বারা হয় তাহলে সেই নারীর বা স্ত্রীর সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়। কাজেই মনু এখানে নারীদের ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতির প্রথা অনুমোদিত করে পরবর্তী শ্লোকে তার বিরুদ্ধে নানাবিধান দিলেন বিধবাদের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তিনি বিধবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা সংকোচিত করে দিলেন এই নিয়োগে পদ্ধতি।

---

[৪০] মনুসংহিতা - ৯/৬৩.
[৪১] মনুসংহিতা - ৯/৬৪.

[গ] বিধবা এবং বৃদ্ধা অবস্থান ঃ

আমরা যদি মানুষের জীবনকাল দেখি তাহলে দেখব যে বাল্যকাল, যৌবনকাল এবং বিধবা ও বৃদ্ধা অবস্থান। নারীর স্ত্রীশিক্ষা শেষ হয় গৃহ শিক্ষা দিয়ে এবং গৃহশিক্ষার মধ্য দিয়েই যৌবন কালে বিবাহ নামক সংস্কার সম্পন্ন করে বৃদ্ধা অবস্থানে পৌছায়। মনুসংহিতায় স্বয়ং মনু নারীদের জন্য নানা বিধিবিধান দিয়েছেন বিধবাদের ক্ষেত্রে। মনুসংহিতায় নারীর বৈধব্যের পর পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন বলে অনেক পন্ডিতগণ তা মনে করেন। কিন্তু আমরা যদি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে বিধবাদের বা বৈধব্যের পর নারীদের পুর্নবিবাহ সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ বিধান আমরা মনুসংহিতায় দেখতে পাবে না। কিন্তু বিধবা নারীদের জীবন ধারণ করার জন্য কঠোরভাবে বিধান দেওয়া রয়েছে। যথা -

''পানিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা
পতিলোকমভিপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।''[৪২]

অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী যদি পতিলোক অর্থাৎ পতির সাথে ধর্মানুষ্ঠান করে যে স্বর্গাদি লোক অর্জন করতে চায় সেই পতিলোককে লাভ করতে ইচ্ছা করে তাহলে যে ব্যক্তি তার পাণিগ্রহণ করেছে তার জীবিত কালে হোক আর মৃত কালে হোক কোনও অপ্রিয় কাজ সে করবে না। মনু এখনে বলেই দিচ্ছেন যে স্বামীর মৃত্যুর আগে বা পরে স্ত্রীলোক পতির বা স্বামীর কোন অনিষ্ট সাধন করবে না। মনু বিধবাদের ক্ষেত্রে বলে দিচ্ছেন যে, স্বামী বা পতির মৃত্যুর পর তদের কি কর্তব্য বা কি করা উচিত তারও বিধান দিয়েছেন, যথা -

''কামং তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈ: শুভৈ:

[৪২] মনুসংহিতা - ৫/১৫৬.

ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।’’[৪৩]

অর্থাৎ পতির মৃত্যু হলে স্ত্রীলোক পবিত্র ফুল ফল মূলাদি অল্পাহারের দ্বারা জীবন ক্ষয় করবে, কিন্তু ব্যভিচার বুদ্ধি পরপুরুষের নাম উচ্চারণও করবে না। মনু বিধবাদের ক্ষেত্রে বারবার করে এটাই বলছেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কেবলমাত্র তারই সাধনা করবে, অন্য কোনো পর পুরুষের কথা ভাববে না এটাই নারীর ধর্ম। আবার মনু এটাও বলেছেন যে, একমাত্র পতিপরায়ণ স্ত্রীলোকেদের প্রধান ধর্ম হল যে নারী আকাঙ্খা করেন তিনি আমরণ ক্ষমাশীল, নিয়মানুবর্তিনী ও ব্রহ্মচারী হয়ে থাকেন। আর যে নারী তা পালন না করে লোক সমাজে তাকে নিন্দিত হতে হয়। মনুসংহিতায় পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে মনু বিধবা নারীদের নানাবিধ ধর্ম এবং কর্তব্যের কথা বলেছেন।[৪৪]

মনু তাঁর মনুসংহিতায় বলেছেন যে, যদি কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী অল্প বয়সে মারা যান এবং তাদের কোনো সন্তান না থাকে তাহলে সেই স্ত্রীলোক নিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারতেন, কিন্তু নিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তাতে যে পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয় তা ঐ স্ত্রীর সন্তান নয়। মনু যে এখানে বিধবাদের ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতির কথা বলেছেন তা কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীদের দ্বিতীয় পতিগ্রহণের উপদেশ নয়। মনু এটা বলতে চেয়েছেন যে -

‘‘নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্তোপদিশ্যতে।’’[৪৫]

---

[৪৩] মনুসংহিতা - ৫/১৫৭.
[৪৪] মনুসংহিতা - ৫/১৫৮, ১৫৯, ১৬০.
[৪৫] মনুসংহিতা - ৫/১৬২.

অর্থাৎ পরপুরুষের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান কোনো নারীর নিজস্ব সন্তান হতে পারে না, সেরকম যে নারী নিজের পত্নী নয়, তার গর্ভে উৎপাদিত পুত্রও কোনো পুরুষের নিজপুত্র হতে পারে না। মনু বারবার করে এটাই বলতে চেয়েছেন যে, পতির মৃত্যু হলে বিধবার পুনর্বিবাহ সম্ভব নয় কিংবা অন্য পুরুষ থেকে সন্তান গ্রহণ যাতে না করে তার জন্য এত বিধান দিয়েছেন। কাজেই আমরা এটা কোনোভাবেই ভাবতে পারি না যে মনু বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ স্বীকার করেন। মনু যে এখানে নারীকে পতিলোক প্রাপ্তির জন্য পুনর্বিবাহ করতে বারণ করছেন কিন্তু সেই পতিলোকে গিয়ে নারী পরজন্মে কি পাবে তা কিন্তু মনুসংহিতায় স্পষ্ট ভাবে কিছু বলেননি। তার মানেই আমরা এখানে অনুমান করতে পারি যে মনু কোনো ভাবে স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিচ্ছেন না। মনুর বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, মনু কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করেছেন। মনুর কালের আগে থেকে কর্মবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর তার সাথে মনু জন্মান্তরবাদ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন। মনুর ধর্মশাস্ত্রই এই দুটি মতবাদকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। কাজেই মনু বলেছেন যে, পতির মৃত্যুর পর নারীর ব্রতই হল পবিত্র ফল মূল খেয়ে দেহ ক্ষয় করা।

বিধবা নারীদের এই রকম রীতি, নীতি বিধান দেখে সুকুমারী ভট্টাচার্য মনে করেন যে -

‘‘মনুর সময় কালে নারী তার বহুবিধ অধিকার একে একে হারিয়েছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিতে সে ঊনমানব অর্থাৎ শুধু সতীদাহই নেই মনুতে, কিন্তু

স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকার নির্দেশ আছে।''[৪৬] মনুসংহিতায় আমরা দেখতে পেলাম যে, নারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল বিধবা হওয়ার পর কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে দেহক্ষয় করার কথা বলেছেন মনু, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে পত্নীর মৃত্যু হলে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেই নতুন পত্নীগ্রহণ করার কথা বলেছেন। যথা -

''ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণৌ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মনি

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ।''[৪৭]

মনুসংহিতায় আমরা দেখলাম যে, বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ নিয়ে মনুর কোনও রকম সুস্পষ্ট বিধান নেই, তবে পৌনর্ভব পুত্রের কথা আমরা পাই, যা মনুকে ভাবতে বাধ্য করেছিল। কারণ তখনকার সমাজব্যবস্থায় পৌনর্ভব পুত্রদের অবস্থান স্বীকৃত ছিল। পৌনর্ভব পুত্র বলতে কী বোঝায় এবং এই পুত্রদের অবস্থান মনুর সমাজ ব্যবস্থায় মানতে বাধ্য ছিল কেন? মনুসংহিতায় দেখি অনেক পন্ডিত পতি পরিত্যক্ত নারীর পুর্নবিবাহের জন্য দুটি শ্লোকের কথা বলেছেন। যথা -

''যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছায়া

উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে।

সা চেদক্ষতযোনি: স্যাদ্‌গতপ্রত্যাগতাপি বা

পৌনভর্বেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি।''[৪৮]

অর্থাৎ পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত বা বিধবা স্বেচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করে যে পুত্রকে জন্মদান করে, সে পৌণর্ভব নামে পরিচিত হয়। আবার সেই নারী যদি

---

[৪৬] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *বিবাহপ্রসঙ্গে*, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ: নং ৪৪.
[৪৭] মনুসংহিতা - ৫/১৫৮.
[৪৮] মনুসংহিতা - ৯/১৭৫, ১৭৬.

অক্ষতযোনি অবস্থায় অন্য কাউকে আশ্রয় করে তাহেল সেই দ্বিতীয় পতি পুনর্বিবাহ নামক সংস্কারের যোগ্য হয়। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় পৌণর্ভব পুত্রের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা ছিল তা হল পিতৃধনের অধিকার ছিল না। কাজেই তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় পুত্র সন্তান একান্ত কাম্য ছিল। তাই মনু এই সব ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করলেও নারীদের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ শিথিল করেননি।

এবার মনু এটা দেখানোর চেষ্টা করছেনে যে, নারীদের সম্পত্তির অধিকার আছে কীনা এবং কিরকম পরিস্থিতিতে, কোন অবস্থায় তারা সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে তারও বিধান দিয়েছেন মনুসংহিতায়। নারীদের স্ত্রীধনের অধিকার আছে কীনা এবং যদি থেকে থাকে তাহলে কিভাবে সেই অধিকার পেতে পারে তারই বিধান দিয়েছেন মনু। মনু বলেছেন যদি কোনো নারীর স্বামী উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, নির্বীজপাপ রোগগ্রস্ত স্বামীকে ত্যাগ করলে কোনো দোষ হয়না এবং নারী তার প্রাপ্ত ধন সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হয় না। আবার বিধবাদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে, নারী তখনই ধনসম্পত্তির অধিকার পাবে যখন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা জীবনযাপন করবে এবং কোনো রকম পাপ কর্ম না করে মৃত স্বামীর মঙ্গল সাধনে ব্রত থাকবে তখনই সে ধনসম্পত্তি অধিকার পাবে। আর যদি কোনো নারী সেই ধন সম্পত্তির অধিকারিনী হয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তাহলে তাঁর সমস্ত ধন সম্পত্তি পুনরায় তারে থেকে কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে শাস্তি স্বরূপ তার ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। নারীদের স্ত্রীধনের অধিকার ছিল কীনা সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। স্ত্রীধন বলতে বিয়ের সময়ে কন্যার আত্মীয়েরা কন্যাকে যা দেয় তাই স্ত্রীধন। মনু যেহেতু বলেছেন যে নারীদের কোন নিজস্ব স্বাধীনতা

নেই, তাই নারীদের সমস্ত স্ত্রীধন স্বামী ও স্বামীর পরিবারে। তাঁর ফলে স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার স্বামীরাই ভোগ করে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, স্ত্রীকূলটা, দুশ্চরিত্র ও উৎশৃঙ্খল হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্বামী ভোগ করেন। মনু বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে স্ত্রীধনকে রক্ষাকবচ বলেছেন। কারণ স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের বিধবার দুর্দশা লাঘব করবে। তাই বলেছেন যে -

''ঊদ্ধবং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতর: সমম্
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্থমনীশাস্তে হি জীবতো:।''[৪৯]

অর্থাৎ পিতা, মাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃগণ মিলিত হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করবেন। কারণ পিতা মাতা জীবিত থাকলে পুত্রগণ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না। আবার স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে -

''পতৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে।''[৫০]

অর্থাৎ স্বামী জীবিত থাকলে স্ত্রী যে সব অলঙ্কার স্বামীর অনুমতি নিয়ে ধারণ করে, স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ স্বামীর পুত্ররা তা ভোগ করতে পারে না। যদি করে তবে তারা পতিত অর্থাৎ পাপী হবে। মনু আরো বলেন যে -

''সংবৎসরং প্রতীক্ষেত দ্বিষন্তীং যোষিতং পতি:
ঊদ্ধং সংবৎসরাত্বেনাং দায়ং হৃত্বা ন সংবসেৎ।''[৫১]

অর্থাৎ স্ত্রী যদি পতিকে ত্যাগ করে তাহলে পতি এক বৎসর অপেক্ষা করবে এবং এক বৎসরের পর তার সমস্ত ধন সম্পত্তি নিয়ে নেবে এবং তার সঙ্গে আর বসবাস করবেন না। মনু আরও বলেছেন যে, যদি স্বামী স্ত্রীর ব্যবস্থা না

---

[৪৯] মনুসংহিতা - ৯/১০৪.
[৫০] মনুসংহিতা - ৯/২০০.
[৫১] মনুসংহিতা - ৯/৭৭.

করে প্রবাসে গেলে স্ত্রী তখন তার সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না। কাজেই এক্ষেত্রে মনু নারীদের কোনো অর্থনৈতিক অধিকার দেয়নি। তার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে নারীরা যেহেতু পরনির্ভর সেহেতু তাদের নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, তাই তারা কিভাবে ধনসম্পত্তি রক্ষা করবে। তাই নারীদের ধনসম্প্তির ওপর কনো অধিকার থাকলে না। মনু বলেন যে, নারীদের যেহেতু নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নেই, নিজেদেরকে রক্ষা করেতে পারে না, তাই তারা বাইরে গিয়ে কীভাবে কাজ করবে বা উপার্জন করবে। তাই নারীদের উপার্জনের পথও বন্ধ করে দিলেন। এই ভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষরা নারীদেরকে ধীরে ধীরে গৃহবন্দিনী করলেন এবং নারীদেরকে গৃহের কাজকর্মে নিজেদের নিযুক্ত রাখতে বললেন। তার সাথে এটা বলা হল যে, কেবলমাত্র তারাই উপার্জন করতে পারবে যাদের স্বামী প্রবাসে গেলে স্ত্রীর ভরনপোষণের ব্যবস্থা না করে দিয়ে গেলে তখন স্ত্রী সূতাকাটা প্রভৃতি শুদ্ধ কর্ম ও শিল্পের দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারবেন। যথা -

''বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেনেন্নিয়মমাস্থিতা
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ।''[৫২]

মনুসংহিতা আলোচনা করে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হল যে, মনু সম্পূর্ণভাবে নারী বিদ্বেষী ছিলেন। তাই মনু তাঁর 'মানবধর্মশাস্ত্র' গ্রন্থে নারীকে কোনোভাবেই স্থান দেননি। মনুসংহিতায় নারীদের বিরুদ্ধে যে নানারকম বিধিবিধান দিয়েছেন তা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি বিধান ছিল তা পুরুষের বংশ মর্যাদাকে এবং নিজেকে ধর্মের

[৫২] মনুসংহিতা - ৯/৭৫.

হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। তা অবশ্য ভাবে পালনীয় বলে গণ্য হয়নি। কাজেই মনু চূড়ান্ত ভাবে নারী বিদ্বেষী ও নারী নিন্দার ধারক ও বাহক ছিলেন। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল তা চূড়ান্ত নারী বিদ্বেষ নিয়ে। নারীর মানবিক অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। নারী সত্ত্বার কোনো স্বীকৃতি থাকলে না মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে। মনু নারীকে মানুষ হিসেবে না দেখে নারীকে কেবলমাত্র প্রজননের যন্ত্ররূপে দেখেছিলেন। নারীর জন্মকে বলা হয়েছে আজন্ম পাপ। মনু তাঁর মনুসংহিতায় নারী এবং শূদ্রকে এক করে দেখিয়েছেন। মনু নারী এবং শূদ্রকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন এবং নারী ও শূদ্রের জন্য একই বিধান দিয়েছেন। যথা -

''ন ধর্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ

ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্বন স্ত্রীশূদ্রদম্ভ নম্।

প্রেত্যেহ চেদৃশা বিপ্রা গর্হ্যন্তে ব্রহ্মবাদিভি:

দৃদ্মনাচরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি।।''[৫৩]

মনু যেভাবে শূদ্রদের পদানত রাখার কথা বলেছেন অনুরূপভাবে নারীদের জন্যও একই কথা বলেছেন। মনু বলেন, পূর্বজন্মের পাপের ফলেই শূদ্রের হীন জন্ম হয়, তেমনি নারীদের ক্ষেত্রেও তাই। মনু এই ভাবে বলেছেন যে, এই জন্মে দেবতার রূপ দ্বিজ ও পতির সেবায় ত্রুটি থাকলে পরজন্মে শূদ্র ও নারীকে আরও হীনপশুযোনিতে জন্ম নিতে হবে। কাজেই মনু মনুসংহিতায় নারীকে যেমন কোনো ভাবেই স্বাধীনতা দেননি, ঠিক তেমনি ভাবে নারীর পাশাপাশি শূদ্রদেরকেও মানুষ রূপে গণ্য করেননি। মনু শূদ্রদের মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করাকে পাপ বলে তুলনা করেছেন। মনু এখানে মনুষ্য ধর্মকেই

[৫৩] মনুসংহিতা - ৪/১৯৮, ১৯৯.

অস্বীকার করেছেন শূদ্র এবং নারীদের ক্ষেত্রে। তা নৈতিক ভাবে কি যথার্থ। মনু কি কোনো ভাবেই মনুষ্য ধর্মকে অস্বীকার করছেন না শূদ্রদের ক্ষেত্রে। মনু মানুষের ব্যক্তি পরিচয়কেই অস্বীকার করেছেন। মনু এখানে এটা ভাবছেন না যে সমাজের অর্ধেক অংশ নারীর যে অবদান তা একেবারে শূন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। মনু কেবলমাত্র নারীকে প্রজননের যন্ত্র রূপে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া নারীর আর কোনো ভূমিকা নেই।

মনু যে সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছেন তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে পুরুষই প্রধান। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা উৎপন্ন হল কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, এই পিতৃতান্ত্রিক যে ধারণা তা কোনো একটি মতাদর্শ নয়। এর নানারকম ভাগ রয়েছে বা তফাৎ রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক একটি সরলীকৃত প্রক্রিয়া নয়, সমাজের শ্রেণী এবং স্তরভেদ বা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে নারীদের ওপরে পুরুষদের আধিপত্যকে বোঝানোর জন্য এই ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেই পিতৃতন্ত্রের উৎপন্ন হল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে পুরুষ তার সম্পত্তিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর বংশধরের হাতে তাঁর সম্পত্তি অর্পন করবেন। কিন্তু তিনি যাকে তার বংশধর বা পুত্র বলে বিবেচিত করছেন তা কি তার নিজের পুত্র। যখন এই সংশয় মাথায় এলো তখন যা থেকে তার বংশধর বা পুত্রসন্তান জন্মায় তাকে রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব নিলেন। এবং যেখানে তখন পুরুষ তাদের কর্মের ভাগ করেদিলেন। নারীকে নজর বন্দিনী করে রাখতে হলে নারীকে সর্বদা গৃহে আবদ্ধ রাখতে হবে এবং পুরুষ বাইরে কর্ম করবে। ফলে নারী ও পুরুষের কর্মের ভাগ হয়ে গেল এবং পুরুষ

বাইরে কর্ম করবে এবং স্ত্রী ঘর সংসার পরিচালন করবে। তারফলে যখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই কথাটি আসছে তখন নারীও পুরুষের মধ্যে একপ্রকার কর্মের ভাগ করে দেওয়া হলো। যখন এই divition of labour টা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে তখন তা মেনে চলার জন্য প্রথমদিকে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পুরুষ নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যথার্থ ভাবে সঠিক করতে যাচ্ছে তখন সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর পুত্র বা তাঁর বংশগত কারো হাতে সম্পত্তি ভার দেবেন। সেক্ষত্রে পুরুষ নিশ্চিত হতে চাইছে যে তাঁর পুত্র বা উত্তরাধিকারী তাঁর নিজের কিনা। তখনই স্বামী স্ত্রীকে সম্পত্তি হিসাবে গন্য করেন তখনই স্ত্রী পুরুষেরর অধীনে চলে যায়। যেখানে সবার আগে তার স্ত্রী যৌনতাকে অর্থাৎ যেখান থেকে সন্তান জন্ম হয় তা রক্ষনাবেক্ষণের জন্য পুরুষ নারীদের ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেন, এইভাবে পুরুষ নারীকে ধীরে ধীরে গৃহবন্দিনী করে তুললেন। আজকে পুরুষ বিবাহ নামক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নারীদের গৃহমুখী করে তোলেন এবং যাতে বর্ণসংকট না হয় তার দিকে নজর দিলেন। এইভাবে পিতৃতন্ত্রের যে ধ্যান ধারনা তা নারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে ধীরে ধীরে নারী ও তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র অস্তিত্ব হারায় এবং পুরুষের অধিন্যস্ত হয়ে বশতা স্বীকার করে। এই পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় জড়িয়ে রয়েছে নারীর যৌনতা বিষয়ে নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নেই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে, বর্ণব্যবস্থার, বর্ণ সংকট ইত্যাদি বিষয়ে নারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা নেই।

কাজেই মনু তার মনুসংহিতায় নারীদের ওপর নানারকম শাসন ব্যবস্থা ও বিধি নিষেধ দিয়েছেন। নারীদের কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত

তারই বিধান দিয়েছেন এবং তা থেকে মুক্তির তথা কোন পাপ করলে তা শাস্ত্র মতে কিভাবে ক্ষয় করা যায় তারই বিধান দিয়েছেন। মানবতার দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে আমরা যদি বিচার করি তাহলে আমরা প্রত্যেকেই মানুষ। আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক মূল্য রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখব যে মনু এক শ্রেণীর মানুষকে তাদের নৈতিক মূল্য এবং কর্তব্য থেকে বঞ্চিত করেছেন। সমাজে ও যে তাদের অবদান রয়েছে সেটাকেই অস্বীকার করেছেন। মনু কোনো ভাবেই নারীর স্বাধীনতা এবং নৈতিক মূল্যকে গুরুত্ব দেয়নি। নারীবাদী দার্শনিকগণ এইখান থেকেই প্রশ্ন করেন তাহলে কী নারী বলে আমাদের মূল্য নেই। মনু এখানে নারীদের বস্তু হিসাবে দেখছে, তাকে অধীনতা বা Submissive Position দিচ্ছে তা নৈতিকভাবে ভুল। আমরা যখন Moral Immoral এর কথা বলি তখন আমরা যে প্রত্যেকে Human being তা ভুলে গিয়ে মনু বারবার করে এটাই বলতে চেয়েছেন নারী মানে পুরুষের অধীন। মনু নারীদেরকে এখানে নিচু বলে অবদমিত করছেন বারবার করে এবং নারীদের কোনো বিষয়েই স্বাধীনতা তিনি দেননি।

পরিশেষে বলা যায় যে, মনুসংহিতায় মনু নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনেক শ্লোক থাকলেও মনু নারীদের কে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বহু জায়গায় নারীদের বন্দনা করেছেন সে সব বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। মনু বলেছেন -

‘‘পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা
পূজ্যা ভূষয়িতবশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ
যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্ততে সর্বাস্তত্রফলাঃ ক্রিয়াঃ।।''[৫৪]

মনু গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম ও বধূকে দেবতা দান বলেছেন। যেমন মনু বলেছেন যে পরিবারে নারীরা সম্মানিত হন সেখানে দেবগণ প্রসন্ন থাকেন। আর যেখানে নারীগণের সমাদর নেই সেখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম সর্বদাই ব্যর্থ হয়। আবার অন্যদিকে বলেছেন যে পরিবারে নারীগণ সর্বদা দুঃখিত থাকেন সেই কুল শ্রীঘ্রই বিনষ্ট হয়। যে পারিবারে নারীদের দুঃখ নেই সেই পরিবার সর্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে। মনু বলেছেন যে।

''জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূতিাঃ

তানি কৃত্যাহতানবী বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ।।''[৫৫]

অর্থাৎ জামিগণ অসম্মানিত হয়ে যে গৃহসমূহকে অভিশাপ দিলে সেই গৃহকূল অভিচারহতের ন্যায় সর্বদিক বিনিষ্ট হয়। কাজেই মনু বলেছেন যে নারীকে সর্বদিক থেকে যদি সুখি রাখা হয় তাহলে সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হয়। আবার মনু নারীকে সংসারে প্রদীপের সঙ্গে ও তুলনা করেছেন। তাই নারীকে তিনি উৎসব অনুষ্ঠানে অলংকার, বস্ত্র, ভোজ্য দিয়ে সম্মানিত করতে বলেছেন। আমাদের এখানে বিশেষ ভাবে যেটা মনে রাখতে হবে যে মনু কিন্তু নারীদেরকে কোনো ভাবেই স্বাধীনতা দেওয়া তে দূরের কথা নারীদের কে মানুষ বলে ও গণ্য করেননি। এই শ্লোকের মানে বা সমার্থ হল এই যে মনু নারীদের এই সব উপহার ও নারীদের সম্পর্কে উপমা দিয়ে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে যাতে নারীদের পুত্র সন্তানের উৎপাদনের যন্ত্র যাতে বিকল হয়ে না যায়, তাই এই সম্মান মনু নারীর নামে যন্ত্রকে সঠিক বা

[৫৪] মনুসংহিতা - ৩/৫৫, ৫৬.

[৫৫] মনুসংহিতা - ৩/৫৮.

বশে রাখার জন্য বলা হয়েছে। সমগ্র মনুসংহিতায় নারীর বন্দনার কোন একটিও শ্লোক নেই, এই কয়েকটি শ্লোক ছাড়া। মনু নারীকে কোনো রূপেই স্বাধীনতা দিতে চাননি। নারী সারাজীবন পুরুষের অধিনতা স্বীকার করে বেঁচে থাকবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। মনু এইভাবে নারীর নৈতিকতাকে অস্বীকার করেছেন সমগ্র মনুসংহিতাতে।

মনুসংহিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় দেবতাদের সমতূল্য ছিল। আর শূদ্র এবং নারীকে কোনো ভাবেই মানুষ বলে বিবেচিত করেন মনু। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, পুরুষ নিজেদের কে দেবতার মর্যাদারূপে গ্রহণ করছে, তাহলে কোন তারা নিজের জননী, জায়া, ভগ্নী, কণ্যা ও বধূদের দেবীর মর্যাদা দিয়ে ওপরে তুলতে পারছে না। কেন তাদের নামিয়ে দিলেন দাসীর সমপর্যায়ে। মনু ব্রাহ্মন নারী এবং শূদ্র নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেননি। মনু সব বর্ণের নারীর জন্য একই বিধান দিয়েছেন। মনু এতটাই নারী বিদ্বেষ যে মনু শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য নয়, পুরুষতন্ত্র ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

-ঃ তৃতীয় অধ্যায় ঃ-

উনিশ শতকে বা আধুনিক যুগে নারী মুক্তির চিত্র এবং তার পর্যালোচনা।

বৈদিক যুগের পরবর্তী সময় থেকেই আমরা দেকে আসছি যে, নারীর অবস্থান আজও পর্যন্ত বিপন্ন। নারীর কোনো স্বাধীনতা নেই, শিক্ষা নেই ইত্যাদি বিষয়ে নারীর কোনো নিজস্ব অধিকার নেই। নারীর অবস্থান হল গৃহ। নারীকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পুরুষ তার আধিপত্য কায়েম রেখে চলেছে। নারীর এই অবদমন দেখে উনিশ শতকে কিছু সমাজ সংস্কারকগণ প্রতিবাদের স্বর তুললেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীদের প্রতি অবিচার ও অন্যায় করে চলেছেন এই সমাজ ব্যবস্থা এবং নারীদের প্রতি এই বিপন্নতার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে নারী বলে সে বিপন্ন। নারী নিপীড়ণ নানা ধরনের, কিন্তু এর একটাই কারণ হল যে, ‘লিঙ্গ’ পরিচয়ে সে নারী, তাই নারী নির্যাতিত হয়ে চলেছে। প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার নারীকে ‘লিঙ্গ’র গন্ডিতে আবদ্ধ রেখে প্রমাণ করতে চায় ‘নারী মানুষ’ হিসাবে অসম্পূর্ণ। তাই উনিশ শতকে কিছু সমাজ সংস্কারকগণ এই প্রতিবাদে স্বেচ্চার হয় এবং ‘নারীমুক্তি’ জন্য দাবী করেন। আমি এখানে মূলত কয়েকজন সমাজসংস্কারকদের নিয়ে আলোচনা করবো, যথা - রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগর। কারণ আমার গবেষণা পত্রের কাজের সুবিধার জন্য আমি সীমিত করে দিলাম। আমাদের এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, ‘নারীমুক্তি’ বলতে নারীর আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়, ‘নারীমুক্তি’ বলতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে নারীদের কে মুক্তি দেওয়া, তথা নারীর নিজস্ব অধিকার স্বাধীনতা ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বীকৃতি দেওয়া। উনিশ শতকে নানা আন্দোলনের পর নারীর অবস্থানের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সমাজ সংস্কারকগণ বলেন যে, ‘নারীমুক্তি’ জন্য নারীদের কে আগে অগ্রসর হতে হবে। নারীরা কি চায়, কি তাদের বক্তব্য সে বিষয়ে আগে নারীদেরকে অবজ্ঞত হতে হবে। আর তার জন্য প্রথমে দরকার নারীর শিক্ষা। কারণ

নারী যদি শিক্ষিতা হয় তাহলে নারী তার বিচার বুদ্ধি দ্বারা কোনটি উচিত আর কোনটি অনুচিত সেই বোধটাকে জাগ্রত করতে পারবে এবং তখনই নারী তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত হবে। তাই নারীশিক্ষা সবার আগে প্রয়োজন। শিক্ষার মধ্যে দিয়েই নারীর মুক্তি সম্ভব হতে পারে। নারী শিক্ষার দ্বারাই স্বাবলম্বী হওয়ার মধ্য দিয়েই নারীর বিপন্নতা থেকে মুক্তি হতে পারে।

উনিশ শতকে আমরা প্রথম স্ত্রীশিক্ষার কথা পাই ব্রিটিশদের শাসনকালের সময় ব্রিটিশ সাহেবরা তাদের পত্নী বা স্ত্রীদের বা মেম সাহেবদের স্ত্রীশিক্ষা দিতেন। তার কারণ হল ব্রিটিশরা যখন স্ত্রীদের সঙ্গে কথপোকথন করবেন যাতে স্ত্রীরা তা বুঝতে পারে তার জন্য স্ত্রীদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হল আবার স্ত্রী বা মেম সাহেবের কাছে যারা কাজ করতেন সেই কর্মচারী যাতে কোনোভাবে বুঝতে না পারে যে, ব্রিটিশ সাহেবদের স্ত্রীরা অশিক্ষিত তার জন্যও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন হল। এছাড়াও অপর একটি কারণে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন ছিল যে, ব্রিটিশদের যে সন্তান হত তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মায়ের শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কারণ শিশুর প্রাথমিক ও মূল শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন মায়ের হাত দিয়েই হত। কাজেই মায়েদের যথেষ্ট শিক্ষা ও বেশি স্বাধীনতার দরকার ছিল। যোগ্য মায়েদের হাতে যোগ্য শিশুরাই হয় ভবিষ্যতের কর্ণধার। কাজেই ভবিষ্যতের কর্ণধার তৈরি জন্য স্ত্রীশিক্ষার অবশ্য প্রয়োজন ছিল এবং স্ত্রীশিক্ষার জন্য নানা স্কুল তৈরি হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে মিশনারি শিক্ষা থেকে বেথুন সাহেবের স্কুল, কুন্দবালা ভুবনমালাদের নতুন জীবনে পদক্ষেপ[১] ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা শিক্ষা পেতে শুরু করলেন এবং এই শিক্ষা আরো বাড়তে শুরু করলো। কিন্তু এই শিক্ষা নারীর

[১] পুলক চন্দ, *নারীবিশ্ব*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ: নং ৯৯.

স্বাধীনতাকে প্রকাশ করা বা নারীমুক্তির জন্য শিক্ষা ছিল না। এই স্ত্রীশিক্ষা ব্রিটিশরা তাদের স্ত্রীদের দিতো যাতে তাদের ভবিষ্যতের কর্ণধার তৈরী করতে পারে তার জন্যই এই স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এতটাই বাড়তে শুরু করে যে নারীরা নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে। এই পথ ধরে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, এই শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে নারীদের চিন্তাভাবনার যে পরিধি বাড়তে শুরু করলো তখন সেই পরিধিটা কে কি সমাজ স্বাগত জানালো? এই শিক্ষার পরিধিকে সমাজ স্বীকৃতি দিলো কি দিলো না? আমরা দেখতে পাই যে সমাজ কখনোই এই চিন্তাধারা পরিধিকে স্বীকৃতি দেয়নি। উনিশ শতকেরে দ্বিতীয় দশকে বাংলার নারীশিক্ষা শুরু হয়েছিল। এখানে 'নারী' ও 'শিক্ষা' এই দুটি শব্দেরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাধারণত ভাবে উনিশ শতকের নারী সংক্রান্ত আলোচনায় 'নারী' বলতে মূলত বোঝানো হয় যে, 'ভদ্র' ঘরের মেয়েদের কথা আর 'শিক্ষা' বলতে নাগরিক প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে (Metropolitan Institutional) কে বোঝায়।[২] পাশ্চাত্য প্রভাবই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য উদারনীতিবাদ ও যুক্তিবাদের আলোয় সামাজিক মূলবোধগুলির পূর্ণমূল্যায়নের সূত্রেই মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন এবং সেই উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি উনিশ শতকরে সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

[২] পুলক চন্দ, *নারীবিশ্ব*, কলকাতা, পৃ: নং ১০০.

স্ত্রীশিক্ষাকে প্রথম থেকেই পুরুষদের শিক্ষা থেকে পৃথক করে দেখানোর জন্য স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি নিয়ে সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র সহ বিভিন্ন মুদ্রিত গণমাধ্যম, বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। এখানে মূলত তিনটি প্রশ্নকে ঘিরে বিতর্ক হয়েছিল। যথা -

[ক] স্ত্রীশিক্ষার আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কীনা?

[খ] যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসৃত হবে?

[গ] স্ত্রীশিক্ষার বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত?[৩]

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে রক্ষণশীল বঙ্গ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপত্তির কারনগুলির চমৎকার ভাবে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ব্যাখ্যা করেছেন 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে[৪], সেগুলি হল -

[ক] 'শিক্ষা কর্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রী জাতির তা নেই।

[খ] 'স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখনো নেই, অতএব লোকাচার বিরুদ্ধ'।

[গ] 'স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখে চিরকাল জীবনযাপন করবে।'

[ঘ] 'স্ত্রী জাতি বিদ্যাবতী বলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হবে'।

[ঙ] 'বিদ্যার অহংকারে মত্ত হয়ে গুরুজনকে অবজ্ঞা করবে।'

[চ] 'পরিশেষে স্বয়ং পতিত হবে'।

---

৩ পুলক চন্দ, *নারীবিশ্ব,* কলকাতা, পৃ: নং ৮৯.
৪ বিনয় ঘোষ, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র* (৩য় খন্ড), পৃ: নং ৫৪২.

‘অতএব স্ত্রী জাতিকে সর্বদা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত।’

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সসাময়িক যে সব পত্র পত্রিকা স্বেচ্ছার হয়েছিলেন তাতেও স্ত্রীশিক্ষার কি আদৌ কোনো প্রয়োজন রয়েছে কী না সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে? আর যদি প্রয়োজনও থাকে তাহলে স্ত্রীশিক্ষা কেমন হবে এবং তার পাঠ্যসূচী কি রকম হওয়া উচিত সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, স্ত্রী জাতি কোনো ভাবেই শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য নয়। তাই নানা রকম প্রশ্ন করে স্ত্রী জাতিকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে স্ত্রীদেরকে সর্বদা পুরুষের অধীনে রেখেছে। তাছাড়াও অপর একটি কারণ হল যে, পুরুষরা যেহেতু নিজেরাই শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রগতি করতে পারেনি তাই নারীদেরকেও সেই সুযোগ দিতে চায় না। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় আমরা এটাও দেখতে পাই যে, অনেকে নিজেদের মেয়েকে স্কুলে পাঠাত না, আর পাঠালেও তারা তাদের মেয়েদেরকে বিজ্ঞান এই বিষয়টিতে পড়াতো না। কেবলমাত্র কলা বিভাগে পড়াতেন। সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, একজন নারীকে শিক্ষা ব্যবস্থা দেওয়া হলেও সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দেওয়া হলো যে নারীরা কি পড়বে এবং কতটা পড়তে পারবে, নারীদের কতটা তার জানা উচিত। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্ত্রীর নারীমুক্তি হলেও যদি আমরা স্ত্রীর নারীমুক্তির চিত্রটি যথার্থভাবে বিচার করি তাহলে দেখব যে নারীমুক্তি প্রকৃতপক্ষে তখনও আসেনি।

[অ] রাজা রামমোহন রায় ঃ- (১৭৭২-১৮৩৩)

উনিশ শতকে বাংলার নব জাগৃতির পথিকৃৎ রামমোহন রায় বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন সতীদাহ প্রথার বিপন্ন নারীর সমর্থনে পদক্ষেপ দিয়ে। তথ্য সহযোগে তিনি বলেন যে, সতীদাহ প্রথারও আরো আগে থেকে পরিবারে সমাজে নারী নির্যাতিত হয়ে আসছে। রাজা রামমোহনের মতে, সংসারে একজন নারী একাধারে রাঁধুনি, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী মাত্র, তাছাড়া নারীর আর অন্য কোনো ভূমিকা নেই। তাঁর ভাষায় -

‘‘বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধঅঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন, স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে।’’[৫]

তাই রামমোহন রায় নারীমুক্তির জন্য বলেছেন যে, সবার আগে নারীদেরকে স্ত্রীশিক্ষা দিতে হবে। যদি নারীরা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে না পারে তাহেল কখনোই এই দাসত্ব বৃত্তি থেকে মুক্তি পাবে না। এই দাসত্ব বৃত্তি থেকে নারীদের মুক্তিও পেতে গেলে আগে তাদের শিক্ষার প্রয়োজন। বাস্তবে দেখা যায় যে নারী বিপন্ন তার কারণ একটাই, যথা নারী শুধুমাত্র নারী বলেই বিপন্ন। এই বিপন্নতার থেকে মুক্তি হতে পারে তখনই যখনই নারী শিক্ষা অর্জন করবে। উনিশ শতকে চিহ্নিত নারী নিপীড়ণ হল সতীদাহ প্রথা। এমন একটি সময় ছিল যখন বাঙালি হিন্দু নারী স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে বাধ্য হত। এই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আলোড়ন শুরু হয় এবং আন্দোলনের অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করে রাজা রামমোহন রায়। এই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় তিনটি বই লিখেন এবং এই সতীদাহ প্রথাকে

---

[৫] অজিত কুমার ঘোষ, *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ: নং ২০৩.

রামমোহন রায় বলেছেন - 'স্ত্রীবধ প্রথা'। তিনি বলেন সহমরণ না করলে স্ত্রীলোকেরা ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হবে, এই ভয় দেখিয়ে, স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাদের আয়ূ শেষ করা হয়। সংসারে নারীদের দাসবৃত্তি হৃদয়বিদারক বিবরণ দেওয়ার পর রামমোহন এই বর্বর প্রথার প্রবর্ত্তকদের উদ্দেশ্যে বলেন -

''দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনাকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।''[৬] এইভাবে রামমোহন ধীরে ধীরে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন এবং বাংলার নারীমুক্তির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু কেবলমাত্র সতীদাহ প্রথা রোধ হলে কী নারীমুক্তি সম্ভব? সতীদাহ প্রথার মতো আরো এমন প্রথা রয়েছে যা নারীমুক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন - বাল্যবিবাহ, বিধবাগঞ্জনা ও নির্যাতন, কন্যাবিক্রয়, কন্যাপণ, বরপণ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা ইত্যদি। এই সব প্রথা যদি প্রচলিত থাকে তাহলে কোনোভাবেই নারীমুক্তি সম্ভব নয়। তাই এইসব প্রথার অবসান তখনই ঘটবে যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষরা নারীদের সমমর্যাদা ও স্বাধীনতা দেবে এবং নারীদেরকে পুরুষের সমকক্ষ রূপে বিবেচিত করে তাহলে নারীমুক্তি সম্ভব। সমাজে নারীর ও যে গুরুত্ব রয়েছে তা স্বীকার করে নারীদেরকেও পুরুষদের মতো করে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তখনই নারীমুক্তির সম্ভাবনা থাকবে। তার আগে কোনোভাবে নারীমুক্তি সম্ভব নয়।

---

[৬] অজিত কুমার ঘোষ, *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ: নং ২০৩.

ঊনিশ শতকে মেয়েদের কয়েকটি মাত্র সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। সেগুলি হল - স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, কৌলিন্য ও বাল্যবিবাহের যন্ত্রণা, বিধবার ব্যঞ্জনা ইত্যাদি বিষয়গুলি বেশি করে আলোচনা করা হত। কিন্তু বিশ শতকে এই সম্যাগুলির সঙ্গে দেখা দিয়েছে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রসঙ্গ, ব্যক্তিজীবনে এবং সমষ্টি জীবনে সমানাধিকার এর প্রসঙ্গ মেয়েদের রাজনৈতিক আন্দোলনের যোগ দেওয়ার যৌক্তিকতা ইত্যাদি। মেয়েদের সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা বঙ্গমহিলায় (১২৭৭) স্ত্রীশিক্ষা বিষয় নিয়ে দুটি বিতর্ক হয়েছিল। যথা -

ক। মেয়েরা ঘরে বসে শিক্ষা লাভ করবেন, না শিক্ষার জন্য ঘরের বাইরে বেরোবেন।

খ। সুগৃহিনী বা সুমাতা হওয়ার জন্য যে শিক্ষা দরকার সেটুকু মেয়েরা পাবেন, না পুরুষের মতো শিক্ষালাভের অধিকার হবেন তারা।[৭] শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের আর্থিক ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা বা স্থাপিত করা এবং আর্থিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেতে চায় মানুষ। নারী শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

[আ] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :- (১৮২০-৯১)

একটি সমাজ বা জাতি কতটা উন্নত সেটা যদি বিচার করা হয় তাহলে আগে সেই দেশে বা জাতির মধ্যে নারীর অবস্থান কেমন ছিল সেটা দেখেই অনায়াসে অনুমান করা যায়। কারণ কোনো দেশ বা জাতি তখনই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায় যখন সেই দেশ বা জাতি নারীর সমস্ত বিষয়ে অধিকার,

[৭] পুলক চন্দ, *নারীবিশ্ব*, কলকাতা, পৃ: নং ১৭২.

স্বাধীনতা এবং নারীর প্রাপ্য সম্মান দেয়। আমরা যদি বিদ্যাসাগরের সময় কাল বিচার করি তাহলে দেখব যে উনিশ শতকে নারীমুক্তির জন্য অনেক মহাপুরুষই প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন। নারীর প্রাপ্য অধীকার এবং স্বাধীনতার জন্য আজীবন লড়াই করেগেছেন। উনিশ শতকে নারীমুক্তির যে চিত্র আমরা দেখি তাহলে দেখব যে, সেই সমাজ ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ প্রচলন কথায় নারীরা তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে, একটি সমাজে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুভব করেছিলেন যে, নারীদের মুক্তির জন্য আগে শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ যদি শিক্ষা না থাকে তাহলে নারীরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হবে না। তাই তিনি গণমাধ্যম শিক্ষা যথা Mass Education এর দ্বারা সমাজের পরিবর্তন আনতে চাইলেন।[৮] তিনি প্রথমেই মনে করেছিলেন। সমাজে পরিবর্তন আনতে গেলে আগে জাতিভেদ প্রথা, লিঙ্গ বৈষম্য উচ্ছেদ করা দরকার। সমাজে পরিবর্তন আনতে গেলে সর্বাগ্রে নারী শিক্ষার প্রয়োজন। যদি নারী শিক্ষার প্রচলন না হয় তাহলে কখনোই সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

উনিশ শতকে সময় সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন যারা নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেন এবং তারা বলেন যে, নারীর কি আদৌ কোনো শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ১৮৫০এর আগে government নারীশিক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃতপক্ষে নারীশিক্ষার জন্য

[৮] South Calcutta Girls' Colleges (edi), *our place our space our case*, Ebang Mushayera, 2016, পৃ: নং ৮৫.

রাধাকান্ত দেব এবং মিশনারী গুলি বেশি পদক্ষেপ নিয়েছিল।[৯] তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন স্কুলের Secretary ছিলেন এবং তিনি নারী শিক্ষার জন্য বেশি করে Mass Education এর ওপর আলোকপাত করেছিলেন। তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের মতো করে নারীদের জন্য স্কুল খোলার চেষ্টা করেছিলেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের মধ্যে নারীদের শিক্ষার জন্য ৩৫টি স্কুল খুলেছিলেন।[১০] হিন্দু মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিদ্যাসাগর আজীবন লড়াই করে গেছেন।

বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেন যে, বাল্যবিবাহ নারীর শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে দেয় না এবং বাল্যবিবাহের জন্য নারীরা অল্প বয়সে বিধবা হয়। তাই বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য ১৮৫০ সালে আন্দোলন করেন এবং কার্যকরী আইন প্রণয়নের দাবী করেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত থাকার ফলে বহু বিধবার গ্লানি ও নারীর অত্যাচার তাকে ব্যথিত করে। সেইজন্যেই তিনি এই গ্লানি মুক্তির জন্য সমাজে একনিষ্ঠ একবিবাহের আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।[১১] সমাজের সব কুসংস্কার বাধা অন্ধকার দূর করার জন্য তিনি নারীশিক্ষা প্রসারে চেষ্টা করেন। নারীর অমর্যাদা অত্যাচার দেখে তিনি শাস্ত্রানুসারে বাল্যবিবাহ,

---

[৯] তদেব, পৃ: নং ৮৫-৮৬.

[১০] তদেব, পৃ: নং ২২.

[১১] উমা সেনাপতি, *বিবাহ ও পরিবার,* বাক প্রতিমা, কলকাতা, ২০০৪, পৃ: নং ২৪৩.

বহুবিবাহ দূর করারও বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন।[১২]

বিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর বলেছেন যে, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রচেষ্টা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে পরিবারে ও বিবাহে সুশৃঙ্খলা ও কল্যানের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি তার একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিধবাবিবাহ সমর্থনে বলেন - ''বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এবিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙমুখ নই। আমি দেশাচারের দাস নাহি, নিজের বা সমাজের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।''[১৩] পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিহিত কর্ম বলে স্থির করে বিখ্যাত শাস্ত্রবচন উল্লেখ করেছেন। যথা -

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসনারী নাং পতিরেণ্যো বিধীয়তে।।[১৪]

অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মৃত হলে, ক্লীব স্থির হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে বা সমাজ পতিত হলে স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিহিত। বিবাহের ইতিহাস, উদ্ভব ও সংজ্ঞা বিষয়ে বলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছেন যে বিবাহ

---

১২ তদেব, পৃ : নং ২৪৪.
১৩ *বিদ্যাসাগর রচনাবালী* (বাল্যবিবাহ), পৃ: নং ৪.
১৪ তদেব, পৃ: নং ৯.

মাধ্যমে স্ত্রীপুরুষ একটি সহজাত অপ্রতিরোধ্য সম্বন্ধে পরস্পর মিলিত হয়ে সজাতীয় উন্নতি ও বংশবিস্তারে যত্নবান হয়। অর্থাৎ‘‘বিশেষতঃ মনুষ্য জাতীয়েরা একস্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে। যখন আত্মপর বিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যাতিরেকে সংসার যাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহ সম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারন।’’[১৫]
আবার তিনি বাল্যবিবাহের বহু দোষ আলোচনা প্রসঙ্গে অতিস্পষ্ট সত্য কথা বলেছেন -

‘‘বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখনও আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের যন্ত্রণায় সংসারযাত্রা নির্বাহকরণ বিষয়ে ও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, সকল সুখের মূল্য যে শারীরিক স্বাস্থ্য তাও বাল্য পরিণয় প্রযুক্ত ক্ষয় পায়। ভূমন্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থাবির দশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয় বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ। বিদ্যাশিক্ষার মুখ্যকাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্য দশা উপস্থিত হয় বাল্য বিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম।’’[১৬]

বহুবিবাহের ফলে এককালে যে ভয়ংকর ভাবে নারী নির্যাতন, অবেহলা ও অমর্যাদা ঘটেছে তার প্রতিবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর। ‘‘প্রভূতাসম্পন্ন প্রবল পুরুষ জাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান

---

[১৫] *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (২ খন্ড), পৃ: নং ৬৮৮.
[১৬] তদেব, (বহুবিবাহ), পৃ: নং ১৬১.

করেন। এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষ জাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশত: স্ত্রী জাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তন্মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর।''[১৭]

কাজেই বিদ্যাসাগর বলেছেন যে নারীমুক্তি তখনই সম্ভব যখন সর্বাগ্রে নারীশিক্ষা জাগরন হবে। তিনি নারীদের মুক্তির পথ কিছুটা হলে প্রশস্থ করেছিলেন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রচলন করে। বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়াতে নারীরা দীর্ঘদিন শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ পায়। ফলে শিক্ষা যেহেতু নারীমুক্তির অন্তরায় কাজেই বিদ্যাসাগর সেই দিক থেকে নারীমুক্তির জন্য সহায়ক ছিলেন। তিনি নারী পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠানের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। শিক্ষা প্রসারে তাঁর কর্মযজ্ঞের তুলনা নেই। তিনি স্ত্রীজাতির জন্য অকপট অনুভব ও সহানুভূতি, তাদের দুঃসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার থেকে মুক্তি আন্দোলনে ও রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ডিরোজিও, তাঁর শিষ্য ও অনুরাগিবৃন্দ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ[১৮] পর্যন্ত এযুগের সকলেই এগিয়ে এসেছিলেন।

[ই] স্বামী বিবেকানন্দ ঃ- (১৮৬৩-১৯০২)

---

[১৭] ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, *ধর্মতত্ত্ব,* পৃ: নং ৬৪৭-৬৪৯.

[১৮] স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ নং ৭৩৮-৭৩৯.

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার বিশ্লেষণে তাঁর সামাজিক ধ্যানধারণার কিছুটা অবতারণা অপরিহার্য লক্ষ্য করা যায়। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে স্বামীজীর সামাজিক ধ্যান ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার পর্যালোচনা করতে হয়। স্বামীজী শিক্ষার এবং ধর্মের বর্ণনা দিয়েছেন - ‘‘শিক্ষা হলো মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ, আর ধর্ম হলো মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।’’[১৯] কিন্তু স্বামীজী সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝিয়েছেন যে, শিক্ষার এই অতি ধারণা (Super Concept) জনসাধারণ ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। তাই তিনি শিক্ষার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন - যে অনুশীলন দ্বারা ইচ্ছা শক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে ও ফলপ্রসু হয় তাকেই শিক্ষা বলে।[২০] সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়।

প্রথমত ঃ শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছা শক্তির (will power) কাজ করে তার প্রভাবটি বিস্তার করে। ব্যক্তি কোন স্বয়ংচল যন্ত্র নয়, শুধু প্রতিবন্ধকাধীন বলে সে যন্ত্রবৎ আচরণ করে। অতএব শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষ গড়া, ধর্মের উদ্দেশ্য ও একই।

দ্বিতীয়ত ঃ ইচ্ছশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কি উদ্দেশ্যে? নিশ্চয়ই সমাজকল্যানের উদ্দেশ্যে। কারণ সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির অস্তিত্ব ও কল্পনা করা যায় না।

---

[১৯] *বিবেকানন্দের বীনা ও রচনা* (অষ্টম খন্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ নং ৪০০.

[২০] *The complete works of swami Vivekananda*, Calcutta, ১৯৬২, পৃঃ নং ৪৯০.

তৃতীয়ত ঃ শিক্ষা হল অনুশীলন যার দ্বারা মানুষের অন্তর্মুখী ও বর্হিমুখী উভয় প্রকৃতিরই সমন্বয় সাধন সম্ভব। সুতরাং শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উন্নয়ণমার্গ। ধারণাটি সংক্ষিপ্ত প্রকাশ পাওয়া যায় স্বামীজির একটি উক্তিতে। প্রশ্ন আকারে উক্তিটি হল - ''যে বিদ্যার উন্মেষে হতর সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্র বল পরার্থ তৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা।''[২১] কাজেই স্বামীজীর কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া, সুতরাং প্রকৃত শিক্ষাই কখনো তথ্যাধিক্য ভিত্তিক হতে পারে না। অতএব যে শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তা মানুষ গঠনকারী, চরিত্র গঠনকারী ধ্যানধারণার সমন্বয় না হতে পারে না।[২২]

ভারতের পুনরুত্থানকল্পে যে দুটি লক্ষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল তা হল নারীজাতির মুক্তি ও জানসাধারণের উন্নতিসাধন। তিনি চেয়েছিলেন যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের পথ উন্মুক্ত হোক। স্বামীজীর মতে নারীজাতি ও জন সাধারণের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উপরেই নির্ভর করেছে ভারতের উন্নতি ও সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান। ভারতের ধর্ম ও শাশ্বত সনাতন অধ্যাত্মভিত্তিক সংস্কৃতি থাকবে সেই শিক্ষার মূলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে সাধন পথে চিরকালই নারীদেরকে দূরে সরিয়েছে রেখেছে, তাই তিনি সচেতনভাবে নারীজাতির কথা চিন্তা করেছেন এবং বলেছেন যে, নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবন সমভাবে

---

[২১] *বিবেকানন্দের বানী ও রচনা* (নবম খন্ড); ১৩৮৪, পৃ. নং ১০৭.

[২২] *The complete works of swami Vivekananda*, Calcutta, ১৯৬৪, পৃ. নং ৩০২.

উন্নত না হয় তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়, যেমন 'এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।'[২৩] কাজেই স্বামীজী বলেন যে মানুষ মাত্রেরই যে দুটি বিষয়ে জন্মগত অধিকার থাকা উচিত, সেই শিক্ষা ও স্বাধীনতার দ্বারা সম্পূর্ণ রুদ্ধ। অতঃপর সংসার এবং লোকাচার নিয়ে নারীর জীবনযাত্রা। আমাদের দেশে জনসাধারণ ও মেয়েদের অবস্থা কতটা শোচনীয় ছিল তা স্বামীজী উল্লেখ করেছেন - ''শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপ নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসী স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।''[২৪] আরও বলেছেন যে - 'তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে, নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।''[২৫] শাস্ত্রকারের উক্তি ঃ - 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' - অর্থাৎ পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন। স্বামীজী নির্দেশিত স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থা পুরুষদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেশ কিছুটা পৃথক, তার দুটি কারণ যথা -

প্রথমত, নারীকুলের সমস্যা অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির।

দ্বিতীয়ত, গৃহস্থালির উৎকর্ষ বহু পরিমাণে স্ত্রীলোকদের উপর নির্ভরশীল।

সমাজভেদে নারীদের অবস্থান বিশেষ সমস্যার ও প্রকারভেদ দেখা যায়। আমাদের মতো দেশের সমস্যা হলে অবরোধ প্রথার, পরাধীনতার এবং

---

[২৩] *বিবেকানন্দের বানী ও রচনা* (সপ্তমখন্ড), কলকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ নং ২৪৪.

[২৪] তদেব, (ষষ্ঠ খন্ড), কলকাতা ১৩৮৩, পৃঃ নং ৩৬৬-৩৬৮.

[২৫] তদেব, পৃঃ নং ৩৮৯.

পরনির্ভরশীলতার। বিদ্যাসাগর নারীদের সমস্যাসমাধান করতে চেয়েছিলেন আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে, কিন্তু স্বামীজী সমাধানের সুত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন - ‘স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহায়তার’ (Self help and mutual aid) মধ্যে। এর জন্য নারীর পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল নারীকে নারী করে গড়ার শিক্ষা, যে শিক্ষা তাদের মধ্যে নির্ভীকতা এবং স্বাবলম্বনের ভাব গড়ে তুলবে। অতএব স্বামীজীর মতে, স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কিছু ইংরেজী।[২৬] সুশৃঙ্খলিত গৃহস্থলির পক্ষে এর উপরে আরও কিছু প্রয়োজন যা শিক্ষাসূচীর মধ্যে রয়েছে যথা রন্ধনবিদ্যা, সূচীশিল্প, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর এই সকল নির্দেশ প্রায় এক শতাব্দী আগে ঘোষিত হয়েছিল যখন গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বা সন্তান সন্ততির পরিচর্যা স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পাঠক্রমভুক্ত হয়নি।

বিবাহ ও পরিবার কল্যানের জন্য স্বামীজী স্বাস্থ্য, জাতি, বর্ণ, বয়স ও পুরুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা চিন্তা করতে বলেছেন। ধন নয় আমাদের আদর্শ হল আত্মোপলব্ধি। স্বামীজী নারীজাতির উন্নতি কল্পনার জন্য পাশ্চ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবাধারাকে সমন্বিত করেছিলেন। একদিকে শিক্ষা ও কর্ম শক্তিতে স্বনির্ভর হবে নারীসমাজ, আবার অন্যদিকে ভারতীয় মাতৃ আদর্শ লালন ও ধারণ করবে সমাজ। নারীর ভালোমন্দ বিচারে পুরুষের কর্তৃত্ব স্বামীজী অনুমোদন করেননি। শিক্ষার ফলে মেয়েরা নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারবে। তাই তিনি বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি আইনের দ্বারা সমাজ

---

[২৬] স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ,* কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ নং ৫২৭.

সংস্কারের চেয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন চাইতেন। তবে বাল্যবিবাহকে তিনি সমর্থন করতেন না। তাঁর মতে সমষ্টি ছাড়া ব্যক্তির মুখ ও অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং সমষ্টির প্রতি সহানুভূতি নিয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করা ব্যক্তির কর্তব্য। জীবনের প্রতিটি স্তরে নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য আছে। স্বামীজী আরও বলেন যে নারীদের এমন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এমনভাবে শিক্ষিত হতে হবে যে যাতে নারীরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। তিনি বলেছেন -

''এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুন্যক্ষেত্র ভারতে এখনো মেয়েদের চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, ত্রুটি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না। আদর্শ নারীচরিত্র সকল ছাত্রীদের সম্মুখে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগ রূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্ম দিতে হবে। সত্যিকার কিছু শিক্ষা চাই। খালি বই পড়া শিখলে চলবে না। যাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজেদের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে এই রকম শিক্ষা চাই। ঐ রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা নিজেই সমাধান করবে। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আদর্শ ও দায়িত্ব সমান।''[২৭]

স্বামীজী নারীমুক্তির জন্য বলেছেন যে সর্বাগ্রে নারীশিক্ষা প্রয়োজন এবং সেই শিক্ষা হলো এমন শিক্ষা যে শিক্ষা নারীকে স্বাবলম্বি করবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। তিনি কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষাকে যথার্থ বলেননি। তিনি বলেছেন যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া

[২৭] স্বামী বিবেকানন্দ, *ভারতীয় নারী,* কলকাতা, পৃঃ নং ৫১.

যায় তাকেই তিনি প্রকৃতি শিক্ষা বলেছেন। বস্তুত তাঁর মতে লেখাপড়া শিখে কর্মক্ষম হওয়া পুরুষ এবং নারীর পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাকেই স্বামীজী চরম মুক্তি প্রকৃত স্বাধীনতা বা জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য পরম সত্য লাভ, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। ব্যবহারিক জগতে অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তিনি কোন ভেদ করেননি। উপনিষদে বলা হয়েছে - ‘‘ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী’’[২৮] অর্থাৎ তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, কুমারী ও তুমি এ তত্ত্ব হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। ‘‘আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।’’[২৯] স্বামীজীর বানীতেই সর্বপ্রথম নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা বা জাগরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং স্বামীজীর যে দৃষ্টিভঙ্গি তা দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমরা শিক্ষার পাশাপাশি দেখছি যে অর্থনৈতিক ভাবে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এবং এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে নারী নিজেদেরকে কতটা অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। আর্থিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমরা দেখার চেষ্টা করছি যে, নারীদের কোনো আর্থিক স্বাধীনতা ছিল কিনা? এই আর্থিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারীদের মূল্য কতটা ছিল এবং নারী কি কি কাজ করতে পারবে। তখন বলা হয়েছে যে, নারীদেরকে সেলাই শেখানো, গান শেখানো, রন্ধন বিদ্যা ইত্যাদি যথা যা গৃহস্থালীর কাজ। নারীদেরকে এমনভাবে গৃহস্থালীর কাজে নিপুন এবং দক্ষ

---

[২৮] *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ* ৪/৩.

[২৯] *বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (সপ্তম খন্ড), পৃঃ নং ৯.

করতে হবে যাতে নারী পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব বহন করতে পারে, সেই শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষার পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে সামাজিক অধিকার এর কথা। তথা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে নারীর অধিকার, গৃহে অধিকার, ভোট দানের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নারীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে। একই ভাবে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু নারী আইনি অধিকারে বলা হয়েছে সামাজিক পারিবারিক বহু বঞ্চনা নির্যাতন যথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সন্তানের অধিকার না পাওয়া, সম্পত্তিতে অধিকার না পাওয়া, বরপণের অত্যাচার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার না থাকা ইত্যাদি থেকে অন্তত আইনি মুক্তির আশ্বাস পেয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলিম নারীদের নির্যাতন বঞ্চনা দূর হয়নি। কারণ সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বাধায় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। মুসলিম পারিবারিক যে আইন চালু হয়েছিল সেগুলিতে কয়েকটিতে নারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও সর্বক্ষেত্রে নারীদের জন্য সুবিধাজনক ছিল না। তার কারণ হল আইনি ব্যবস্থার মধ্যেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ টিকে থাকে।[৩০]

বিশ শতকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথ ধরেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ক্রমশ প্রসারিত হয়, আর তখনই নারী পুরুষের সম অধিকার, নারীর আইনি অধিকার, ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের কথা। নারীদের সমানাধিকারের দাবি বার বার উচ্চারিত হয় ভারত মহিলা, সুপ্রভাত, নবপর্যায় পরিচারিকা, বঙ্গলক্ষী ও জয়শ্রী প্রভৃতি পত্রিকায়। ভারত মহিলা

---

[৩০] যশোধর বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা,* মানবী বিদ্যাকেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১ এর, পৃঃ নং ৭৯.

প্রথম প্রকাশে ঘোষণা করে - ''রাজনীতিই হোক আর শিল্পবিজ্ঞানই হোক, পুরুষের পার্শ্বে নারী না দাঁড়ালে পুরুষশক্তি কখনও সম্যকবিকাশ হতে পারে না। নারীর উন্নতি করে, নারীকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষজাতিকে অগ্রসর হতে হবে। এই সমুহৎ দুস্কর কর্মে কথাঞ্চিৎ সাহায্য করার জন্য ভারত মহিলার জন্ম।'' যুগ যুগ ধরে আইন ছিল পুরুষের পক্ষে এবং সেই আইন তৈরি করেছে পুরুষই। কাজেই মেয়েদের আইনি অধিকার আদায় করতে গেলে লড়াই করতে হবে। নারীর সম অধিকার বা আইনগত অধিকারের দুটি দিক। যথা - (i) ব্যক্তি জীবনে নারীর অধিকার। (ii) সমষ্টি জীবনে অধিকার, যে কথাটা স্বামীজী আগেই বলেছিলেন যে নারীদের ব্যক্তি জীবনও সমষ্টি জীবনের অধিকার সম্পর্কে নারীদেরকে অবগত হতে হবে। ব্যক্তিজীবনে ন্যায্য অধিকার নিয়ে সম্মানের সঙ্গে যাতে মেয়েরা বেঁচে থাকতে পারে সে বিষয় মতামত প্রকাশ করেছে বঙ্গলক্ষীতে। সেখানে বলা হয়েছে যে-

(i) পুরুষগণ এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয়বার পরিগ্রহ করিতে পারবে না।

(ii) পরিত্যক্তা স্ত্রীর ভরণপোষণে স্বামী বাধ্য থাকবে।

(iii) বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর অধিকার থাকবে।

(iv) পৈতৃক সম্পত্তিতে প্রত্যেক নারীর আইনত দাবি ও অধিকার থাকবে।[৩১]

ব্যক্তি জীবনে মেয়েদের অধিকার পাওয়ার ব্যাপারে নানা মতবিরোধ এর মধ্য দিয়েই সমষ্টি জীবনে নারীদের অধিকারের প্রশ্নটি উঠে আসে। সমষ্টিও অধিকারের মধ্যে ভোট অধিকারের বিষয়টি বিশ শতকের সময় বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯২১ এ বাংলার মেয়েদের ভোটাধিকারের জন্য যে বিল করা

[৩১] পুলক চন্দ, *নারীবিশ্ব*, কলকাতা, পৃঃ নং ১৮১.

হয়েছিল তা কার্যকরী হয়নি। পুরুষশাসিত সমাজের কাছে যে মানুষ হিসাবে মেয়েদের মূল্য নেই, মেয়েরা তাদের কাছে যে ভোগ্যপন্য তারই প্রতিবাদ জানায় যে - ‘‘নারী কি মানুষ নয়, তবে তাকে জ্ঞানার্জ্জন ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের দাবী হতে বঞ্চিত করে রাখা হয় কেন?’’ অবশেষে ১৯২৩ এ বাংলার মেয়েরা প্রথম কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ও ১৯২৫ এ বিধান সভায় ভোটাধিকার পায় তবে এই ভোটাধিকারের তিনটি শর্ত ছিল, যথা - [i] নারীকে বিবাহিত হতে হবে। [ii] তাকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। [iii] তাকে শিক্ষিত হতে হবে।[৩২] কাজেই উনিশ শতকে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার পায় এবং শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতিতে বাঙালী মেয়েদের চিন্তাধারার যে সংহতি দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্য স্থাপন করে সে সব বিষয়ে মেয়েদের কথা বলার অধিকার পায়। আমরা প্রশ্ন করতে পরি যে, এই পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে নারীর অবস্থানের কি কোনো পরিবর্তন এসেছে বা নারীদেরকে এখানে কতটা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে বৈদিক যুগে আমরা দেখে আসছিলাম যে নারীদের কিছুটা হলেও স্বাধীনতা ছিল তা আবার বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে নারীদের কোনো ভাবেই কোনো কিছুতে স্বাধীনতা ছিল না। সেই সময় থেকেই আবার আমরা উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলনে নারীদের সর্বাগ্রে পূর্ণ অধিকার এবং শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য যে মুক্তি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল তা অনেক পরিবর্তন এসেছে নারীদের ক্ষেত্রে। আজকের নারী অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে এবং নিজের কথা বলার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে।

---

[৩২] কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায়, *রাজনীতিতে নারী,* হাওড়া, ২০০০, পৃঃ নং ১২৬.

আমরা দেখলাম যে, নারীমুক্তি নিয়ে রামমোহন বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রমুখ সমাজ সংস্কারণগণ নানাভাবে প্রতিবাদ করেছেন। রামমোহন আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ভেবেছেন যে নারীমুক্তির উপায় হিসাবে নারীদের জন্য কিছু আইন প্রণয়ণ করেছেন এবং এইভাবে নারীমুক্তি কথা ভেবেছেন। এরা সর্বাগ্রে স্বীকার করেছেন যে সর্বপ্রথম নারীশিক্ষার কথা বলেছেন। আমরা জানি কোনো দেশ বা জাতির উন্নতি সাধন করতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষা থাকলেই কি নারীমুক্তি সম্ভব। আর নারীদের জন্য কিছু আইন প্রণয়ণ করলেই কি নারী তার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা ফিরে পাবে। কাজেই নারীমুক্তি তখনই সম্ভব হবে যখন যেই আইনগুলি বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে নজর দিতে হবে। কেবলমাত্র খাতায় কলমে আইন প্রণয় করলে হবে না, তা বাস্তবে কার্যকরী করে তুলতে হবে। এরা নারীমুক্তির জন্য সাময়িক যা প্রয়োজন সেই বিষয়ে জোর দিয়েছেন। কিন্তু স্বামীজী এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারী মুক্তি তখনই সম্ভব হবে যখন নারী তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে সর্বাগ্রে বাস্তববায়িত করছে। অর্থাৎ যে শিক্ষা নারীদের নারী করে গড়ার শিক্ষা, যে শিক্ষা নারীদেরকে নির্ভীকতা এবং স্বাবলম্বনের ভাব গড়ে তুলে সেই শিক্ষার কথা স্বামীজী বলেছেন। স্বামীজী সহসা নারীমুক্তির কথা না বলে উনি নারীমুক্তির জন্য বলেছেন যে আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের থেকে মুক্তি, যে মুক্তি মোক্ষ প্রাপ্তীর মুক্তি। যেখানে আর নারী পুরুষ ভেদটা থাকে না, সেই মুক্তির কথা স্বামীজী বলেছেন এবং এটাই নারী পুরুষ উভয়েরই চরম মোক্ষপ্রাপ্তী। তাই তিনি নিজেকে একজন চরম সমাজ সংস্কার বলে দাবী করেন এবং নারীদের কাছে তিনি একমাত্র যথার্থ সমাজ সংস্কার হিসেবে পরিচিত।

এবার আমরা নারীবাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করবো বা দেখানোর চেষ্টা করবে যে নারীবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে empowerment এর প্রসঙ্গে শেফালী মৈত্র তাঁর নৈতিকতা ও নারীবাদে ক্ষমতায়নের লক্ষ্য কি ছিল? নারীদেরকে ক্ষমতা দেওয়ার পরে ও তারা কেন empowerment হয়ে উঠতে পারেনি এবং কোথায় তাদের সমস্যা ছিল তা দেখার চেষ্টা করবো? নারীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে স্বশক্তিতে স্বমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে ওঠা ছিল নারীর আদর্শ, অর্থাৎ নারীর ক্ষমতা অর্জন। এটাই ছিল নারীবাদীদের মূল লক্ষ্য। নারীর এই ক্ষমতা অর্জন বা empowerment নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পটি ২৯শে নভেম্বর ২০০১ এ দিল্লিতে উদ্‌ঘাটিত হয়। নারীদেরকে সর্বতোভাবে বলীয়ান করে তোলার জন্য ঘোষিত পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এন জি ও পর্যন্ত সকলে দায়িত্ব থাকে এই প্রকল্পকে রূপায়ণ করার জন্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন হল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যে। নারীদের সর্বোতভাবে বলীয়ান করার জন্য আর একটি সরকারি কর্মসূচি ২০০১ নেওয়া হয়েছিল - ‘দ্য ন্যাশনাল পলিসি ফর দ্য এম্পাওয়ারমেন্ট অব উইমেন।’[৩৩]

এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, ভারতের নারীকে সক্ষম করে তোলার জন্য এত প্রকল্প এবং এত তদন্তর্বতী সুপারিশ প্রয়োজন হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় ২০০১ এর যে পলিসি তার মুখবন্ধে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় সংবিধান রচনার সূচনা পূর্বেই লিঙ্গ সাম্যের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে ভারতীয় সংবিধানে নারীদের জন্য বলা

---

[৩৩] শেফালী মৈত্র, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ নং ১৫৪।

হয়েছিল যে সংবিধানের একাধিক ধারায় লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য অনুমোদন করা হবে না। এই কথাটি সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, মৌলিক অধিকার অংশে আছে, মৌলিক কর্তব্যের তালিকার মধ্যে ও আছে, এমনকী সংবিধানের ডিরেকটিভ প্রিন্সিপল বা নিয়ামক বিধির মধ্যেও আছে। এছাড়াও ভারতের সংবিধানে শুধু যে নারী পুরুষের সাম্যের কথা বলা হয়েছে তা ও নয়, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে নারী তার প্রাপ্য অধিকার পায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল সংবিধানে নারীর অধিকার সম্পর্কে আইন থাকা সত্ত্বেও কোন ২০০১ সালে আলাদা করে নারীদের জন্য পলিশি প্রয়োজন হল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পলিসির ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে মেয়েদের হাল ফেরাণোর উদ্দেশ্যে সংবিধানে, আইন আদালতে এবং বিভিন্ন পলিসি ও প্রকল্পের যে লক্ষ্য ছিল তা সামনে থেকে গেছে। অর্থাৎ তা খাতায় কলমে থেকে গেছে, তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। কাজেই পলিসির যে উদ্দেশ্য আর দৈনন্দিন জীবনে যা পালিত হয় এই দুটির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এই প্রসঙ্গে পলিশির ভাষাটি এরকম যে -

‘‘However, there still exists a gap between the goals enunciated in the constitution, legislation, Policies, plans, Programmes and related mechanisms on the one hand and the situational reality of the status of women in India, on the other.’’[৩৪]

কাজেই আমরা দেখছি যে ১৯৭৪ এবং ১৯৮৮ এই দুটি রিপোর্টেই ভারতের মেয়েদের দূরাবস্থার কথা বলা হয়েছে। কাজেই যে পলিশি গুলি এবং সংবিধানে যে আইনগুলি নারীদের জন্য পাশ করা হয়েছিল তা কেবলমাত্র

[৩৪] শেফালী মৈত্র, *নৈতিককতা ও নারীবাদ,* কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ নং ১৫৪.

খাতায় কলমে থেকে গেছে, তার বাস্তব রূপায়ণ হয়নি। যার ফলে ভারতীয় নারীদের এই রকম অবস্থা ভোগ করতে হচ্ছে।

২০০১ সালে মেয়েদের জন্য যে পলিশি গঠন করা হয়েছিল তাতে মেয়েদের যে অধিকার সব পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয় এবং এও বলা হয়েছে যে নারীকে সব মানব অধিকারের 'ডি জুরে' (de jure) বা আইনি অধিকার এবং 'ডি ফ্যাক্টো' (de facto) অর্থাৎ কার্যকর অধিকার দিতে হবে।[৩৫] কিন্তু এখানে যে সমস্যা থেকে যায় তাহল আইন বা পলিশি যাই আদেশ দিক না কোন তা বাস্তবে পালিত হচ্ছে কিনা সেটার নজরদারি করার কোন ব্যবস্থা রাখা হল না। ফলে নামেই নারীদের আইনি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, কিন্তু তা কার্যকরি হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কারোর মাথা ব্যাথা নেই। অপর আর একটি সমস্যা দেখা যায় যে, আইনে চর্যার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। নারীদের জীবন যাপনের পরিমন্ডলের মধ্যেই কিন্তু লিঙ্গ বৈষম্য প্রোথিত আছে, যা দেশের বিধি ব্যবস্থা, আইন আদালত সব কিছুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, সমাজের অনুশাসন মানলে নারীর মর্যাদা ও সহানুভূতি প্রাপ্য হয় আর না মানলে অবাঞ্ছনা, অবহেলার পাত্র হয়। কাজেই দেশের বিধিবিধান, আইন সবকিছুই একটি ক্ষমতার বলয় তৈরী করে রেখেছে যা একজন নারীকে সর্বোত ভাবে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে বাধা দেয়।

কাজেই নারীবাদী দার্শনিকরা বলবেন যে, নারীদের কে এই ক্ষমতার বলয় থেকে মুক্তি পেতে গেলে এই যে ক্ষমতার বলয় গুলি আছে সেগুলিকে

---

৩৫ শফালী মৈত্র, *নৈতিককতা ও নারীবাদ,* কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ নং ১৫৫-১৫৬.

ভাঙ্গতে হবে। নারীদেরকে নিজেই নিজের ভাগ্য জয় করতে হবে। তার জন্য নারীমুক্তি আন্দোলনে নারীকে একা এক দেশের কালের অনপেক্ষ ব্যক্তিত্ব সত্ত্বায় বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে। নারীদেরকে সমাজের এই যে অনুশাসন এই অনুশাসন কে ভাঙ্গতে হবে। নারীবাদীরা এটাও বলেছেন যে অনুশাসন মানেই খারাপ নয়। কিন্তু যে অনুশাসনে দ্বিচারিতা আছে, যেখানে ঘোষিত নীতি আর পালিত নীতির মধ্যে পার্থক্য বা তফাৎ আছে সেই অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সমাজের যে লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান যেখানে নারীর ক্ষমতা খর্ব করা হয় সেই সমাজে রুখে দাঁড়াতে গেলে মেয়েদের অপবাদ, অবজ্ঞা, কটূক্তি সব কিছু সহ্য করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল যে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অধিকার কে দিল? সমাজের এক গোষ্ঠির স্বার্থসিদ্ধির ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্যই নারীর অধিকার খর্ব হয়। বৈষম্যের আচরণটির কোনো যৌক্তিকতা নেই। শুধু ক্ষমতার জাহির। আর ক্ষমতাবান মাত্রই অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর সেই ক্ষমতা সবসময় দেখানোর ও প্রয়োজন হয় না। সমাজের কতকগুলি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতার প্রতীক বলে মনে করা হয়। যার ফলে ক্ষমতার বলয়ের প্রান্তে যারা থাকে সবসময় তারা অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে।

নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, নারীদের কে ক্ষমতা দেওয়ায় তারা যদি ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহার করতে না পারে তাহলে কোনোভাবেই নারীমুক্তি সম্ভব নয়। ক্ষমতা পেয়ে যদি তা সমাজের পরিকাঠামো বদলানোর জন্য প্রয়োগ করা না হয় তাহলে নারীর অবদমনের উৎসগুলি নির্মূল হয় না। নারীর প্রতি যে বৈষম্য তা দূর করতে গেলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে

সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। নারীর ক্ষমতা অর্জনের সমস্যাটিকে বুঝতে গেলে আমাদের কে স্বার্থ এবং ক্ষমতার এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটটিকে বোঝা দরকার। অর্থাৎ আমাদের কে চর্যা, প্রতিষ্ঠান ও ধারণার কাঠামোর মধ্যে দেখতে হবে যে এই তিনটি স্তরে বৈষম্য রয়েছে।[৩৬] নারীবাদী দার্শনিকরা বলেন যে, কেবলমাত্র আইনের, প্রতিষ্ঠানে এবং ধারণার মধ্যে থাকলে হবে না, অর্থাৎ সামাজিক ও মানবিক স্তরে পরিবর্তন না ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতা বা সক্ষমতার যে প্রকল্প তা রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। নারীদের প্রতি যে এই প্রকার বৈষম্য তা যদি আমরা নৈতিকতার দিকে থেকে দেখি তাহলে দেখব যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ নিজেদের আধিপত্যকে কায়েম রাখা জন্য নারীদের প্রতি এই রকম আচরণ করে। ধারণার কাঠামো বলতে আমরা বুঝি যে সেই সব গোড়ার বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রকল্প যা কোনো ব্যক্তির নিজের ও জাতের সম্পর্কের মতামতগুলি প্রতিফলিত হয় অথবা ধারণাগুলিকে গঠন করতে প্রভাবিত করে। যা সমাজ দ্বারা নির্মিত এবং যা সাহায্যে মানুষ নিজেকে ও আশেপাশের জগতকে এই ধারণার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে। এই ধারণার কাঠামো তখনই শোষকে রূপান্তরিত হয় যখন এটি একপ্রকার সর্ম্পকে যুক্ত হয়, যেখানে একে অপরকে শোষণ ও শাসন করে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারীদের কে ক্ষমতা দেওয়ার পরে ও নারীরা empowerment হয়ে উঠতে পারেনি। নারীরা তখনই empowerment হয়ে উঠতে পারবে যখন পুরুষের সহযোগীতা পাবে, পুরুষ এর সহযোগীতা বীনা নারী একা কখনোই empowerment হয়ে উঠতে পারবে না।

---

[৩৬] তদেব, পৃঃ নং - ১৬২-১৬৩

নারীবাদী দার্শনিকগণ ও empowerment এর দ্বারা নারীমুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে empowerment এর দ্বারাও নারীমুক্তি সম্ভব নয়। 'বিশ্বনারী সম্মেলনে' আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে নারীর অধিকার নিয়ে নানা ঘোষণা পত্রে নারীর অধিকার মুক্তি ও মর্যাদার প্রশ্নে কিছু বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেগুলি হল শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, অর্থনীতির বাস্তবায়ন, দরিদ্রদূরীকরণ, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ, মানবাধিকার, পরিবেশ, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সমতা, প্রচার মাধ্যম তথ্য প্রযুক্তি, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। এই সবগুলি অত্যন্ত জরুরি বলে বিবেচিত হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক সংগঠনের একতাবদ্ধ পদক্ষেপ।[৩৭] কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, একুশ শতকে নারী শুধু নারী বলেই সর্বত্র নিপীড়িত। কাজেই একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, নারীসমাজের অবস্থান পুরুষসমাজের নীচে কিংবা নারীর নির্যতক ও নিপীড়কের যে চেহারাটি তা পুরুষের হলেও ব্যক্তি পুরুষ বা পুরুষ সমাজ নয়। বিশ্বব্যাপী রক্ষণশীল, পুরুষ আধিপত্যপূর্ণ, পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, সমাজের কাঠামো, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আইন, সংবিধান, দৃষ্টিভঙ্গি এসবই নারীর বিপন্নতার মূলে।[৩৮] পুরুষ ও নারী উভয়েই ব্যক্তি হিসাবে এই পুরুষতান্ত্রিকতার আঘাতে জর্জরিত। কাজেই নারীমুক্তি বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে নারী ও পুরুষের উভয়েরই মুক্তি তখনই সম্ভব যখন নারী এবং পুরুষ মিলিত শক্তিই এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে পারবে।

---

[৩৭] শেফালী মৈত্র, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, পৃঃ নং ১৫৮-১৫৯.

[৩৮] তদেব, পৃ: নং ১৬৩.

সুতরাং নারী আজও বিপন্ন। নারীর প্রতি সহিংসতা এই একুশ শতকেও প্রবলভাবে বিরাজ করছে, সেটা যেমন নিষ্ঠুর সত্য, তেমনি সত্য এটাও যে এ থেকে মুক্তির জন্য জরুরি রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় নারীর যুক্ত হওয়া, নেতৃত্ব দেওয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি সেই লক্ষ্যে নারী ও পুরুষের সচেতন, সমন্বিত এবং আন্তরিক প্রয়াস।[৩৯]

কাজেই আমরা দেখতে পচ্ছি যে, নারীদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া, অধিকারের জন্য এত লড়াই, নারীদের এগিয়ে আসার জন্য এত প্রচেষ্টার পরও তাদের ওপর নির্যাতন কিন্তু বন্ধ হয়নি। কোনো না কোনো ভাবে নারীদেরকে বাইরে গিয়ে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৈদিক সাহিত্যের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারীদের অবস্থানের যে চিত্র তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজের অগ্রগতির এত উন্নতির পরেও নারীদেরকে নানাভাবে বঞ্চিত হতে হয় এবং নানা বিষয়ে লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয়। কাজেই কোনোভাবেই নারীমুক্তি সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম নারীবাদীদের দৃষ্টিকোন থেকেও নারীদের ক্ষমতা দেওয়ার পর ও নারীরা empowerment হয়ে উঠতে পারেনি। আমরা যদি উনিশ শতকে যে সমাজ সংস্কারকগণ নারীমুক্তি প্রচেষ্টা করেছেন সেক্ষেত্রে কি কোনো ভাবে তারা নারীদের empowerment-এর কথা বলেছেন সেটা দেখানোর চেষ্টা করবো। আমরা যদি ভালো ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে উনিশ শতকেও নারীদের empowerment করে তুলার

[৩৯] তদেব, পৃ: নং ১৬৪-১৬৫.

চেষ্টা হয়েছে। এই পর্যায়ে নারীদের empowerment লক্ষ্য করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীমুক্তি জন্য সর্বাগ্রে স্ত্রীশিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নারীদেরকে empowerment এর পথকে সূচিত করে। নানারকম আইন কানুন ইত্যাদি নারীদের জন্য তৈরী হয়েছিল। যা নারীদের ক্ষমতায়নের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, উনিশ শতকে সমাজ যতই উন্নত হোক না কেন নারীদের ক্ষমতা লাভের জন্য কিছু মানুষের ধ্যান ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা নারীর ক্ষমতায়নকে স্বাগত জানাই নি। উনিশ শতকে নারীশিক্ষার জন্য যখন বেথুন স্কুল তৈরী হল তখন বেশির ভাগ মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো না। খুব কম সংখ্যক মেয়ে স্কুলে স্ত্রীশিক্ষার জন্য গিয়েছিল। কাজেই আইন প্রণয়নের দ্বারা empowerment বা ক্ষমতায়ণ করা যায় না। সেই আইনের যথার্থ ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আগে মানুষের ধ্যানধারণা পাল্টাতে হবে। তবেই empowerment সম্ভব হবে। আবার আমরা দেখতে পাই যে কিছু সংখ্যক পরিবারে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাত না, আবার পাঠালেও তাদের শিক্ষার বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হত। কাজেই উনিশ শতকে empowerment এলে ও তা পুরোপুরি ভাবে আসেনি। আইনি ব্যবস্থার মধ্যে সব কিছু থাকলেও তার বাস্তবিক প্রয়োগ তখনও কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। কাজেই উনিশ শতকে নারীমুক্তির যে চিত্র তাতে empowerment এলেও তা সর্বাগ্রে empowerment হয়ে ওঠেনি।

-ঃ উপসংহার ঃ-

আমরা যখন নারীমুক্তি নিয়ে কথা বলছি বা নারীমুক্তির কথা ভাবছি তখন প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা নারীমুক্তি বলতে কি বুঝি? নারীমুক্তি বলতে কি এটাই বোঝায় যে, নারীদেরকে কিছু অধিকার দিয়ে দেওয়াটা কি নারীমুক্তি? অর্থাৎ নারীদেরকে কিছু অধিকার দেওয়া বা সুযোগ সুবিধা দেওয়া বলতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ, আর্থিক সংস্থানের কিছু সুবিধা দেওয়া, সামাজিক কিছু অধিকার দেওয়াটা কি প্রকৃতপক্ষে নারীমুক্তি বলবো? নারীবাদী দর্শনের ছাত্র হিসাবে আমরা দেখে আসছি যে ঐ রকম কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার মধ্যে নারীমুক্তি সীমাবদ্ধ নয়। নারীমুক্তির অধিকার শুধুমাত্রা এই সব অধিকারের মধ্যে আবদ্ধ নয়। নারীমুক্তি তখনই সম্ভব যখন আমরা তাত্ত্বিক দিক থেকে এই নারী এবং পুরুষের যে বিভাজন অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি লিঙ্গ বৈষম্য সেই লিঙ্গ বৈষম্য যতক্ষন পর্যন্ত দূরীভূত করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নারীমুক্তি সম্ভব নয়।

বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ তথা ঊনিশ শতক পর্যন্ত নারীর অবস্থান আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখালম যে, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে কিছু সংখ্যক নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কিছু বিষয়ে স্বাধীনতা থাকলেও তা সর্বাগ্রে সকল নারীর স্বাধীনতা সমাজ স্বীকৃতি দেয়নি। আবার বৈদিক যুগের শেষের দিকে ব্রাক্ষ্মন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নারীদের কোনো বিষয়ে আর স্বাধীনতা থাকলো না, এবং কন্যা সন্তান পাপ বলে বিবেচিত হলো। অর্থাৎ নারী জন্মকে পাপ এবং নরকের কীট বলে গণ্য করা হলো। কাজেই বৈদিক যুগের প্রথম দিকে নারীদের কিছু বিষয়ে যে স্বাধীনতা আমরা দেখেছিলাম তা বৈদিকযুগের শেষের দিকে সম্পূর্ণভাবে নারীদের আর কোনো স্বাধীনতা থাকলো না। এমনকি উচ্চবর্ণের নারীদের ও শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা থাকলো না।

আমরা যদি দেখি যে নারীমুক্তির প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বেদের প্রথমদিকে নারীদের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তাতেও নারীমুক্তির কিছুটা চিত্র ফুটে ওঠে। তবে তা সম্পূর্ণভাবে নারীমুক্তির দিক প্রকাশ করে না। কিছু কিছু দিক প্রকাশ করলেও তা পুরোপুরি ভাবে ব্যবহারিক জীবনে সকল নারীর ক্ষেত্রে মুক্তি আসেনি। আবার বৈদিক যুগের শেষের দিকেই নারীমুক্তি কোন রূপ সম্ভাবনা ছিল না। বৈদিক যুগের শেষের দিকে নারীদের সমস্ত অধিকার কুক্ষিগত করেছিল পুরুষ।

আবার আমরা যদি মনুসংহিতা দেখি তাহলে দেখব যে, মনু নারীদের সম্পর্কে যে সকল বিধিবিধান এর কথা উল্লেখ করেছে তা দেখে মনে হয় যে তিনি কোনো না কোনো ভাবেই নারীবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি নারীদের জন্য নানা বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে নারীদের সম্পূর্ণ ভাবে গৃহবন্দিনী করে তুলেছেন, এবং পুরুষরা তার আধিপত্য কায়েম রাখার জন্য নারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছেন। নারীর শিক্ষা, তার স্বাধীনতা সমস্ত কিছু কুক্ষিগত করলেন পুরুষ। নারীর এই অবস্থানের কারণ হিসেবে আমরা দেখে আসছি যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীদের এই অবস্থানের জন্য দায়ী। মনুসংহিতায় যদি আমরা নারীমুক্তি চিত্র খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে দেখব যে মনু নারীদের জন্য যে বিধিনিষেধ গুলি দিয়েছেন তা কোথাও নারী পুরুষের মধ্যে এক প্রকার বিভাজন করেছেন এবং এও বলা হয়েছে যে, নারী মানেই সে গৃহবন্দিনী। আর পুরুষ মানেই উন্মুক্ত। এই বিভাজন মনু নারী পুরুষদের মধ্যে একপ্রকার bias বা বিভাজন তৈরি করে দিচ্ছেন তার বিধানের মধ্য দিয়ে। মনু যে বিধান দিয়েছেন তাতে এটা খুব পরিষ্কার যে নারীর কি কি করণীয়, তার কথা বলা, তার অধিকার সব কিছু ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে।

নারী মানেই সে গৃহিনী, তার রীতিনীতি একরকম এবং নারীর কি কাজ সেই চিত্রটিও নিরূপন করে দিয়েছেন মনু তার মনুসংহিতায় বিধি নিষেধের মধ্য দিয়ে। কাজেই মনুর সময় কালে আমরা কোনোভাবেই নারীমুক্তির চিত্র পাই না। বরঞ্চ নারীদের কিভাবে গৃহবন্দিনী করে তোলা যায় সেই চিত্র স্পষ্ট রয়েছে।

উনিশ শতকে নারীমুক্তির যে চিত্র আমরা দেখলাম এই সময়ে নারীমুক্তির চিত্রটি কিছুটা হলেও পরিস্কার। এই সময় কালে যে সমস্ত সমাজ সংস্কারকগণ নারীমুক্তির জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছেন তা নারীমুক্তির পথকে প্রশস্ত করেছেন। নারীমুক্তির জন্য যেটা বেশি প্রয়োজন তা হল স্ত্রীশিক্ষা। যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে নারী তার অধিকার ফিরে পেতে পারে। যা উনিশ শতকে খুব স্পষ্ট যে শিক্ষা নিয়ে সবাই আন্দোলন করেছিলেন। এতে নারীমুক্তির চিত্রটি ফুটে ওঠে, কিন্তু কেবলমাত্র শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করলেই নারীমুক্তি সম্ভব নয়। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবিক জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই নারীমুক্তি কিছুটা হলেও সম্ভব হবে। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, উনিশ শতকে যে সমস্ত সমাজ সংস্কারকগণ নারীমুক্তির জন্য আন্দোলন করেছিলেন সেক্ষেত্রে যে সম্পূর্ণ ভাবে নারীমুক্তি হয়েছে তা বলা যায় না। কাজেই বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যদি আমরা নারীর অবস্থান দেখি তাহলে কি কোনো ভাবে আমরা বলতে পারি যে, নারীমুক্তি আদৌ সম্ভব হয়েছে পুরোপুরি ভাবে।

আমার গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য নারীর অবস্থান বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর যে অবস্থান তা দেখানোর চেষ্টা

করছি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই ধরণের গবেষণার কাজ একজন সমাজতত্ত্বের ছাত্র করতে পারে? তাহলে আমি দর্শনের ছাত্র হিসাবে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে নতুন কি দেখানোর চেষ্টা করছি? দর্শনের ছাত্র হিসাবে আমার এখানে দেখানোর বিষয় বস্তু হল, এই যে বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ এই সময় কালের মধ্যে কোনো রকমভাবে কোনো সময় কালে কি নারীদের অবস্থান সম্পর্কে তাত্ত্বিক সত্ত্বাকে নিয়ে কোনো রকম কোনো বিশ্লেষণ করা হয়েছে কী না সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি? দর্শনের ছাত্র হিসাবে আমরা দেখে আসছি যে নারীর অবস্থানের কেবলমাত্র কিছু সংস্কার, কিছু সমাজের নিয়মাবলী নয়, নারীর এই অবস্থানের জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের মানসিকতা। যে মানসিকতার মধ্যে আমরা দেখি যে, একজন শিশু যখন জন্মায় তখন তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার একটি লিঙ্গ নির্ধারণ করে থাকি, এবং সেই লিঙ্গ পরিচিতির মাধ্যমে কিন্তু লিঙ্গ বৈষম্য তৈরী হয়। একটি শিশু যথা ছেলে বা মেয়ে জন্মালে তার সাথে কিছু পুরুষালী বা কিছু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য গুলি আরোপ করে থাকি। যেই গুণগুলি আরোপ করি তার দ্বারা চিহ্নিত করা হয় ঐ শিশুটির লিঙ্গ পরিচয়কে। এবং যখনই আমরা এই লিঙ্গ পরিচয়টিকে চিহ্নিত করে দিচ্ছি তার সাথে সাথে তার সত্ত্বাটাও নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। আর যখনই এই সত্ত্বার পরিচয়টি উঠে আসে তখনই চলে আসে লিঙ্গের উচ্চ নিচ স্তরভেদ (Gender Hierkey)। এই উচ্চ নিচ স্তরভেদের সাথে যুক্ত থাকে লিঙ্গ বৈষম্য। যেখানে একটি লিঙ্গের উপরে থাকে আর অপর লিঙ্গটি নিচে অবস্থান করে। যথা পুরুষ উপরে থেকে নারীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আমরা মনুসংহিতায় মনুর বিধানের মধ্যে এই রকম চিত্র স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মনুসংহিতায় মনু বলেছেন যে নারী হল পুরুষের ভোগ্য বস্তু। এখানে

লিঙ্গের উচ্চ নিচ স্তরভেদ খুব স্পষ্টভাবে মনু দেখিয়েছেন। কাজেই আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে এই বৈষম্য নিয়ে আসছে বা রয়েছে। আমরা একটি লিঙ্গকে উপরে আর অপর লিঙ্গটিকে নিচু করে দেখি। ফলে এক প্রকার বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সেখানে অপর লিঙ্গটিকে যতই সুযোগ সুবিধা বা অধিকার দেওয়া হোক না কেনো, যতই অপর লিঙ্গটিকে দাঁড় করাতে চাই না কেন তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ এই প্রকার বৈষম্য আমাদের মানসিকতায় রয়েছে। দর্শনের ছাত্র হিসেবে নারীর মুক্তির জন্য আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে, আমাদের ভাষার মধ্যে যে লিঙ্গের ছাপ রয়েছে তা কিভাবে এলো। তাতে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের ধারণার মধ্যে রয়েছে, আমাদের চিন্তার কাঠামোর মধ্যে রয়েছে। কাজেই আমাদের চিন্তার কাঠামো এমন যে, আমরা ঐ রকমভাবে চিন্তা করি এবং চিন্তার কাঠামো যেমন সেই অনুযায়ী আমরা কথা বলি, চিন্তা করি। কাজেই আমাদের কথা বলা বা বোঝার জন্য যে ধারণা দরকার সেই ধারণার কাঠামো, চিন্তার কাঠামো এবং ভাষার কাঠামোর মধ্যে পিতৃতন্ত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে রয়েছে। আমি দর্শনের ছাত্র হিসাবে তা দেখানো চেষ্টা করছি।

এই যে Gender Hierkey বা লিঙ্গের উচ্চ নিচ স্তরভেদ তা ভাষার মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আমাদের ভাষার মধ্যেও আমরা লিঙ্গের ব্যবহার করে থাকি। মনুসংহিতায়ও আমরা দেখি যে, নারীদের কথা বলার তেমন কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি। নারীদেরকে কেবলমাত্র পণ্য হিসাবে বেচাকেনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নারীর কোনো কিছু বলার অধিকার দেওয়া হয়নি। নারীবাদীদের বক্তব্য হল কেবলমাত্র সমাজের যে চিত্র তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আমরা যখন একটি নারীকে দেখি এবং সেক্ষেত্রে যে ভাষায় ব্যবহার

করে থাকি তাতেও লিঙ্গগত ভাষা ব্যবহার করা হয়। সাধারণত আমরা যখন কোনো দরখাস্ত বা চিঠি লিখি তখন "Dear Sir' বলে থাকি। সেই পদে যদি মহিলাও থাকে তাকে 'Dear Sir' বলে সম্বোধন করা হয়। অর্থাৎ আমাদের ভাষার মধ্যে সবসময় একটা পুরুষালীভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে। আবার আমরা যখন কোনো ইতিহাস (History) দেখি তখন পুরুষের কথা ওঠে আগে। সেক্ষেত্রে নারীর কথা বলা হয় না, বা যদিও বলা হয় তা ব্যতিক্রম। কাজেই আমরা যখন ভাষার ব্যবহার করি তার মধ্যেও লিঙ্গ পরিচয়কে নির্দেশ করি। যেমন আমরা বলে থাকি যে যদি কোনো দম্পত্তির একটি কন্যা সন্তান হলে তাকে আমরা মেয়ে না বলে ছেলের মতো বলি, আবার যদি কোনো মেয়ে সংসারের দায়িত্ব পালন করে তখন তাকে আমরা মেয়ে না বলে আমরা বলে থাকি যে সে ছেলের মতো দায়িত্ব পালন করছে। অর্থাৎ আমাদের বলার মধ্যে সবসময় একটি লিঙ্গের ছাপ থেকে যায়। কাজেই আমাদের ভাষার ব্যবহারের মধ্যে লিঙ্গ ভূমিকা থেকে যাচ্ছে। আমরা যে ভাষা ব্যবহার করে থাকি তা পিতৃতান্ত্রিক এবং তার মধ্যে Gender Bias and 'inequalities' বা লিঙ্গের অসমতা বজায় থাকে। পুরুষদের মধ্যে যে biasness রয়েছে তা পুত্র সন্তানের মধ্যে পক্ষপাত হয়ে ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ঠিক এইরকম ভাবে মনুসংহিতাতেও আমরা দেখতে পাই যে, মনু সময়কালে একমাত্র পুত্র সন্তানের কামনা করা হয়েছে। এবং পুত্র সন্তানের জন্য যজ্ঞও করা হয়েছে, যাতে পুত্র সন্তান হয়। কাজেই মনুর সময়কালেও Biasness এর কথা বলা হয়েছে। আবার এই biasness উনিশ শতকেও দেখতে পাই। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক পরিবারের মেয়েদের স্কুলে পাঠানো হত না এবং তারা মনে করতো যে নারীর কোনো শিক্ষালাভের প্রয়োজন নেই। নারী মানেই তারা গৃহের কাজে

দক্ষ হবে। আর যদিও নারীদেরকে স্কুলে পাঠানো হত তাহলে তাদের পাঠ্যসূচী আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও আমরা লিঙ্গের উচ্চনিচ স্তরভেদ দেখতে পাই এবং Gender Biasness ও রয়েছে।

আমাদের ভাষার মধ্যে যে লিঙ্গের ব্যবহার করে থাকি তার কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হল -

[১] আমরা এমন অনেক বাক্য ব্যবহার করি যা লিঙ্গ ভিত্তিক। যেমন "Chairman' এই শব্দটির ক্ষেত্রে লিঙ্গের ব্যবহার রয়েছে। আমরা জানি যে "Chairman' মানে সেখানে কোনো পুরুষ থাকবে, কিন্তু সেই পদে তো কোনো নারীও থাকতে পারে, তবুও আমরা "Chairman' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। একই রকম ভাবে "Doctor', "Teacher', "Nurse' ইত্যাদি শব্দগুলিও লিঙ্গভিত্তিক। "Doctor' মানেই আমরা পুরুষের কথা ভাবি। কিন্তু "Doctor' মানেই যে সর্বদা পুরুষ হবে এমন নয়, সেক্ষেত্রে নারীও হতে পারে। কিন্তু তবুও আমরা "Doctor' বলে সম্বোধন করি। আবার "Teacher' মানেই আমরা মহিলাকে বুঝি। কাজেই কোনো শব্দ শুনে আমরা কিরকম চিন্তাভাবনা করি সেটা বোঝা যায় এবং কোনো শব্দ শুনে আমরা বলতে পারি যে, সেটা পুরুষকে নির্দেশ করে না নারীকে নির্দেশ করে। কাজেই ভাষার মধ্যেও লিঙ্গের ভূমিকা রয়েছে।

[২] আমাদের ভাষার মধ্যে এ এমন অনেক প্রবাদ প্রবচন আছে যেগুলি নারী ও পুরুষের থেকে অভিন্ন করে দেখায়, যেমন বলা হয় নারীর স্বর্গ কোথায়? তখন বলা হয়েছে স্বামীর চরণে। তার মানেই এখানে দেখানো হচ্ছে যে নারী সর্বদা পুরুষের অধিনে থাকবে। যা আমরা বৈদিক যুগের শেষের দিক থেকে

দেখে আসছি এবং মনুসংহিতায় মনুর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে নারী সর্বদা পুরুষের অধিনে থাকবে। স্বামীর অনুমতি বিনা নারীর কোনো কর্ম ও করতে পারে না। নারী পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে এবং পতির যাতে ভালো হয় ও যদি নারী স্বর্গে যেতে চায় তাহলে পতির ক্ষতি চিন্তা না করে তার মঙ্গল কামনায় ব্রত থাকতে বলা হয়েছে। তবেই নারী স্বর্গ লাভ করতে পারবে। কাজেই আমাদের ভাষার মধ্যেও লিঙ্গের ধারণা রয়েছে। আবার আরও বলা হয়েছে যে , 'অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে'। তার মানেই নারীকে এখানে পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং নারীর কোনো যে নিজস্ব অধিকার নেই তা বোঝা যায়। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে পারে এবং সেই পুরুষ ভাগ্যবান। মনুসংহিতায় এই রকম মনোভাব আমরা মনুর বিধানে দেখতে পাই, কাজেই আমাদের ভাষার মধ্যে লৈঙ্গিক ছাপ রয়েছে।

[৩] আবার দেখা যায় যে, পুরুষকে আমরা Standard বা Norm হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। যেমন 'History', 'Chairman', 'Sportsman', 'One man show' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। তার মানে এখানে বারবার 'Man' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই শব্দগুলি 'man' এর সঙ্গে যুক্ত। এই গুলিকেই যথার্থ মানদন্ড হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং পুরুষকে বেশি করে প্রধান দেওয়া হয়েছে। পুরুষই প্রধান। যা আমরা মনুসংহিতায় দেখেছিলাম যে পুরুষই প্রধান। পুরুষ যা বলবে তাই শেষ কথা। মনুসংহিতায় ও পুরুষকে মনু বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমাদের ভাষার মধ্যে যখন আমরা 'Human' কথাটি ব্যবহার করি তখন 'Human' বলতে কিন্তু আমরা 'Man' কে বুঝে থাকি। ঠিক তেমনি ভাবে নারীবাদী দর্শনে বারবার

করে পিতৃতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে যা পুরুষের একতিয়ারকে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষই সব কিছুর প্রধান। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ভাষার মধ্যে ও লিঙ্গ অতঃপ্রতো ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

কাজেই আমরা যে ভাষার মধ্যে উচ্চনিচ স্তরভেদ টা পাচ্ছি সেক্ষেত্রে একটি মেয়েকে মেয়ে বলে গণ্য করা হয়। তার মানে মেয়েটির আলাদা সত্ত্বা মেনে নেওয়া হচ্ছে। মেয়ে মানেই তার উচিত, অনুচিত, ভালোত্ব, মন্দত্ব ইত্যাদি গুণগুলি নির্ধারণ করে দিচ্ছি। ঠিক তেমনি ভাবে পুরুষেরও গুণাবলীগুলি নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। পুরুষ মানেই সে নারীর ওপর ক্ষমতা কায়েম রাখে। মনু তাঁর মনুসংহিতায় পুরুষালী গুণগুলিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেছেন। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে কালে যে ব্যবস্থা দেখি না কেনো নারী পুরুষের স্তরভেদটি বিদ্যমান থাকে এবং সেই স্তরভেদে পুরুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে কি আমরা নারীমুক্তির যে চিত্রটি খোঁজার চেষ্টা করছি তা কি আমরা কোনোভাবে কোনো কালে দেখতে পাচ্ছি?

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নারীবাদীদের বক্তব্য বহুমুখী। আমরা এখানে আলোচ্য বিষয় বা বক্তব্যগুলি নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে নারীবাদের বক্তব্যের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করবো। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে নারীজাতিকে নানা ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রথমত, এই নীতি দর্শনে পুরুষের স্বার্থ ও অধিকারকেই নৈতিকভাবে মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলে মনে করা হয়েছে। নারীর স্বার্থ বা অধিকার নৈতিকতার আলোচনায় স্থান পায়নি। দ্বিতীয়ত, নারীদের তথাকথিত নিজস্ব জগৎ, যে জগতে নারীরা পরিবারের প্রতি যে

দায়িত্ব পালন করে সেই জগতের সমস্ত সমস্যাকে নৈতিকতার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়েছে। তৃতীয়ত, এই নীতিদর্শনে মনে করা হয় যে, নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের মতো নীতিগত ভাবে উন্নত। এই নীতি দর্শনে পুরুষের নৈতিক ধর্মের আলোকে নারীর নৈতিক ধর্মের মূল্যায়ণ করা হয়। এখানে মনে করা হয় যে, স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, বুদ্ধি প্রভৃতি তথাকথিত পুরুষের গুণাবলী শুধু যে পুরুষ ধর্ম তা নয়, বরং তথাকথিত নারীর ধর্ম অর্থাৎ আবেগ, পরস্পর নির্ভরতা, শান্তি প্রভৃতির তুলনায় বেশি মূল্যবান্য বলে মনে করা হয়। চতুর্থত, পুরুষকল্পিত নৈতিক যুক্তিতে এই নীতিদর্শন শ্রেয় বলে মনে করা হয়, কারণ সেখানে সার্বজনীনতা ও ব্যক্তিসাপেক্ষতা নেই। নারীদের নৈতিক যুক্তিতে আছে সখ্যতা, নিরপেক্ষতা যা পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাশ্চাত্য নীতি দর্শনে কেবলমাত্র পুরুষের নৈতিক ধর্মগুলিকেই কেবলমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যা আমরা বৈদিক যুগের শেষের দিক থেকেই মনুসংহিতায় এই রকম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। মনু তাঁর মনুসংহিতায় পুরুষের নৈতিক ধর্মকেই কেবলমাত্র প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি নারীর নৈতিক ধর্ম তো দূরের কথা নারীর কোনো স্বাধীনতা, যাপিত অভিজ্ঞতা, মূল্য কোনো কিছুরই তিনি গুরুত্ব দেননি। বরঞ্চ তিনি বলেন যে নারীকে যত খুশি সম্ভোগ করা যায়, তাছাড়া নারীর কোনো ভূমিকা নেই। কাজেই পাশ্চাত্য নীতি দর্শনের সাথে মনুর যে নারীদের প্রতি বিধিবিধান তা একই দিক সূচিত করে।

পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে যে চিন্তাধারা তা লিঙ্গ সাপেক্ষ নীতি দর্শনের জন্ম হয়। নারীবাদীদের উদ্দেশ্যে হল এমন একটি নীতিদর্শন উদ্ভাবন করতে হবে যা লিঙ্গ নিরেপেক্ষ। নৈতিকতার লৈঙ্গিক চরিত্র এবং নারীবাদী নৈতিকতার ধারণাটি আদৌ আধুনিক ধারণা নয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকেই নারীদের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল নারীদের বিশেষ ধর্মগুলি কি স্বাভাবিক ধর্ম নাকি সমাজের দ্বারা আরোপিত। আমরা দেখতে পাই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মেরী ওলষ্টোনক্র্যাফট বলেছিলেন যে নারী এবং পুরুষের নৈতিক আদর্শ প্রায় সমান। পুরুষজাতি নারীকে এমন এক সামাজিক পরিবেশে আবদ্ধ রেখেছে যার ফলে তাদের ক্ষমতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নীতিবোধ স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। পুরুষকে যদি সংসারের সীমিত গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হতো তাহলে পুরুষের মধ্যেও সেই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হত যা নারীসুলভ বলে পরিচিত। সমাজ মানুষকে বিভিন্ন ভাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সমাজ শুধুমাত্র পুরুষকে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছে আর নারীকে শিখিয়েছে ভদ্রতা ও সৌজন্য। ওলষ্টোনক্র্যাফট মনে করেছেন যে নারীর মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করার জন্য পুরুষের মতো করে গড়ে তুলতে হবে। নারীরা যেভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে অবদমিত হয়েছে আছে তার থেকে মুক্তি পেলেই তাদের মধ্যে সুপ্ত নীতিবোধ জাগ্রত হবে। এই ভাবেই নারীবাদী দার্শনিকগণ নারীমুক্তির সাথে সাথে নারীর নৈতিক বোধ জাগ্রত করার কথা বলেছেন। নারীমুক্তি এবং নারীর নৈতিক বোধ তখনই জাগ্রত হবে যখন পুরুষদের মতো করে নারী তার অধিকার, ক্ষমতা এবং সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবে বা অর্জন করতে পারবে। কাজেই নারীর মুক্তি এবং নৈতিকবোধ জাগ্রত করার জন্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে যখন একত্রে আন্দোলন করবো

এবং পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন আসবে তখনই সম্ভব। নারী একার দ্বারা এই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কেবলমাত্র যে নারীরা অবদমিত হচ্ছে তা কিন্তু নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অনেক পুরুষকেও ভালো রাখেনি। কারন সব পুরুষই পুরুষালী নয়। কাজেই তাদের ক্ষেত্রেও অবদমন করা হচ্ছে। এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে একত্রে আন্দোলন করতে হবে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নারীমুক্তির যে চিত্র সেই চিত্রের মধ্যে আমরা যে যুগে যে সমাজ ব্যবস্থা দেখি না কেন কোনো ভাবেই নারীমুক্তি সম্ভব হচ্ছে না। যেই সমাজ ব্যবস্থা, যেই সংস্কার, যে যুগের নারীমুক্তির চিত্র দেখিনা কেন সাধারণত ভাবে আমি নারীমুক্তি ততক্ষণ দিতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পিতৃতন্ত্রের কবল থেকে বেরতে পারবো। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফলে আমাদের মানসিকতার মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে সব ক্ষেত্রেই নারীদের কে অবদমন করা হচ্ছে, ফলে আমাদের মানসিকতা যতক্ষণ না পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ নারীমুক্তি সম্ভব নয়। সবার আগে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে, তবেই নারীমুক্তি সম্ভব।

-ঃ গ্রন্থপঞ্জি ঃ-

Books

Altekar, A. S, *The Position of Women in Hindu Civilization,* (2nd edi.), Motilal Banarasidass Publishers Private Ltd., Delhi, 1959.

Bhattacharya, Sukumari, *Women and Society in Ancient India,* Basumati Corporation Limited, Calcutta, 1994.

Kapadia, K. M., *Marriage and Family in India*, Oxford University Press, India, 1968.

Kapur, Monindra, *Women and family life education in India*, Print well publishers, Jaipur, 1986.

Moitra, Shefali, *Feminist Thought*, Munshiram Manoharlal Publishers Private Ltd., Kolkata, 2002.

Our Place our space our case : Women's Issues in Contemporary perspectives, South Calcutta Girls College (সম্পাদিত) Ebang Mushayera, 2016.

ঋষি বঙ্কিম রচনাবলী, *প্রবন্ধ ধর্মতত্ত্ব,* দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৬।

গোপ, যুধিষ্ঠির, *বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৯।

গুপ্ত, সুপর্ণা (সম্পাদিত), *ইতিহাসে নারী : শিক্ষা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১।

ঘোষ, অর্জিতকুমার, *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩।

চট্টোপাধ্যায়, সতী ও ধর্মপাল, গৌরী, *মনুসংহিতা ঃ ফিরে দেখা, বেদের ঋষি,* বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৫।

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী এবং ভট্টাচার্য, প্রীতা, *প্রাচীন ভারতের নারী,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক (প্রকাশিত), কলকাতা, ২০০৯।

চন্দ, পুলক, *নারীবিশ্ব,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫।

তর্করত্ন, পঞ্চানন, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯৩।

দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, *মনুর বর্ণাশ্রম ধর্ম,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক (প্রকাশিত), কলকাতা, ১৯৪২।

দত্ত, রমেশ চন্দ্র (অনু), *ঋগ্বেদ সংহিতা* (প্রথম খন্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭।

পাহাড়ী, অন্নদাশঙ্কর, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৮।

বসু, যোগীরাজ, *বেদের উপনিষদ,* ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশক, কলকাতা, ২০০০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চন্দ্র (ভূমিকা, অনুবাদ ও টীকা), *মনুসংহিতা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।

বসু, রাজশ্রী, *নারীবাদ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ২০১৪।

বিবেকানন্দের বানী ও রচনা (ষষ্ঠ খন্ড), উদ্বোধন কার্য্যলয়, কলকাতা, ২০০২।

বিবেকানন্দের বানী ও রচনা (সপ্তম, অষ্টম, নবম খন্ড), উদ্বোধন কার্য্যলয়, কলকাতা, ২০০৭।

বাগচী, যশোধর ও ভাদুড়ী, অনিনন্দিতা, *মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা,* মানবী বিদ্যাকেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যানী, *রাজনীতিতে নারী,* হাওড়া, ২০০০।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ কলকাতা, ২০১৭।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* ওরিয়েন্টা লংম্যান (প্রকাশিত), কলকাতা, ১৯৯১।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৫।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা ২০১৪

মৈত্র, শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ ঃ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানামাত্রা,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা, ২০১৫।

শাস্ত্রী, মানবেন্দু বন্দোপাধায়, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০০।

শ্রীভূতনাথ, সপ্ততীর্থ, (অনুদিত), *মনুস্মৃতি* মেধাতিথি ভাষ্য (প্রথমখন্ড, দ্বিতীয়খন্ড, তৃতীয়খন্ড, চতুর্থখন্ড), সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৬১।

সেন, সুব্রত, *পণপ্রথা শাস্ত্রে ও সমাজে,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।

সেনাপতি, উমা, *বিবাহ ও পরিবার,* বাক প্রতিমা প্রকাশিত, কলকাতা, ২০০৪।

সিংহ, কিঙ্কর, *মনুসংহিতা এবং নারী,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৫।

স্বামী অরূণানন্দ, *হিন্দুশাস্ত্র,* ভারত সেবাসঙ্গ, কলকাতা, ২০১৫।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ* (প্রথমভাগ), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, (সম্পাদিত), *উপনিষদ* (প্রথমভাগ), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৬২।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,* রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১৩।

স্বামী বিবেকানন্দ, *ভারতীয় নারী,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৭।

Journal

Bhattacharya, Sukumari, *The Position of Woman in Vedic*, India International Centre Qualities 19. No. 4(1992) : 40-52.

Chakrabarty, Uma, *Vedic Dought*ter, Annals of the Bhamdarkqar Oriental Research Institute, 81, No. 1/4 (2000) : 179-189.

Jaiswal Swira, *Women in Early India : Problems and Perspective*, Proceedings of the Indian History congress. 42, (1081) : 54-60.

Philosophical Explorations

UGC-Sponsored, One-Day State Level Seminar

organised by

The Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata

10th ~~4th~~ **May 2019**

This is to certify that Jagannath Jana *of* Jadavpur University *presented a paper titled* মনুসংহিতায় বিবাহতত্ত্ব-প্রসঙ্গ : ভারতীয় দার্শনিক অনুসন্ধান *during the One-Day State-level Seminar, "Philosophical Explorations", organised by the Department of Philosophy, Jadavpur University, held on ~~4th~~ 10th May, 2019.*

P. Sarkar

Professor Proyash Sarkar

Head of the Department

Maushumi Guha

Dr. Maushumi Guha

Goswami

Dr. Gargi Goswami

Coordinators